রমেন গুপ্ত

গ্রিনরুম থেকে কোর্টরুম

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫২

স্বত্ব : রমেন গুপ্ত

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক : অরিজিৎ কুমার। প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : সুধীর সিকদার। সিকদার প্রিণ্টার্স
১৫এ নলিন সরকার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৪

অকালপ্রয়াত অগ্রজ মঞ্চাভিনেতা

মহেশ গুপ্ত-র

স্মৃতিতে

'গ্রিনরুম থেকে কোর্টরুম' দীর্ঘদিনের তথ্যানুসন্ধানের আয়াসসাধ্য গবেষণার ফসল। নাট্যলোকের এক অলিখিত অকথিত কাহিনী এখানে বিধৃত। এ-কাহিনীর বিস্তার কলকাতার পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের সূচনা থেকে শুরু করে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আদালত থেকে দেউলিয়া ঘোষণার দিন পর্যন্ত। এই বিস্তৃত সময়সীমার মধ্যে সে-যুগের নাটক, নাট্যশালা ও নট-নটীদের ঘিরে বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত যেসব উল্লেখ-যোগ্য অভিযোগ আদালতের আঙিনায় উপস্থাপিত হয়েছে, দুঃখ-সুখের সেসব কাহিনী নিয়ে এ-রচনার বিন্যাস। সেকালের থিয়েটারের নেপথ্যে আদালতের চার দেওয়ালের মধ্যে কলকাতার নাট্যশালার বন্দী ইতিহাস এখানে এক চলমান চিত্রশালা।

গ্রন্থরচনায় বন্ধুবর শ্রীত্রিদিব দত্তর উৎসাহ ও সহযোগিতা সবিশেষ স্মরণ করি।

রমেন গুপ্ত

সে-যুগটা ছিল কলকাতার বাবুমশাইদের যুগ। বড়োলোকদের ঘরে ঘরে দোল দুর্গোৎসব চড়ক আর গাজনের সমারোহ। সেকালে সম্পন্ন ধনীরা সম্পদের রেষা-রেষিতে আনন্দ পেতেন। ঘুড়ি ওড়ানো, পায়রা ওড়ানো, পাল পার্বণে আর উৎসবে বাজি পোড়ানো আর সামাজিক অনুষ্ঠানে বাঈজি নাচ লেগেই থাকত। কার নাচঘরে কতগুলো ঝাড় লণ্ঠন, কার জুড়িগাড়ির ঘোড়ার অঙ্গে কত দামের সুরভি মাখানো হয়, কে কত মোসাহেব পোষেন—এসব ছিল তখনকার কালে আলোচনার বিষয়। বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে সম্ভ্রান্ত ধনীরা নিজেদের ধন্য মনে করতেন। আনন্দ পেতেও যেমন তাঁরা জানতেন, আনন্দ দিতেও জানতেন। পাড়ায় পাড়ায় বসত গানের মজলিশ যাত্রার আসর। চলত শখের থিয়েটারের অভিনয়।

কলকাতায় থিয়েটার শুরু করেছিলেন রাশিয়ান শিল্পী হেরাসিম লেবেডেফ। সেটা সতেরো শ' পঁচানব্বই সাল। তারপর কলকাতার প্রমোদস্পৃহিতে একের পর এক বিশিষ্ট ধনীরা এসেছিলেন নাটক পরিবেশনায়। আঠারো শ' একত্রিশ সালে জোড়াসাঁকোর প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দু থিয়েটার। অভিনীত হয়েছিল উত্তরা রামচরিত ও শেকস্‌পীয়রের জুলিয়াস সীজারের কিছু অংশ। উত্তর কলকাতার আর এক অভিজাত ধনী শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর জায়গাটা নিয়ে নাট্য-শালা গড়ে উপহার দিলেন বিদ্যাসুন্দর নাটক। নতুন বাজার অঞ্চলের আর এক ধনী রামনাথ বসাকও এগিয়ে এলেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক উপহার দিলেন। এছাড়া সেকালে নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে স্মরণীয় নাম জোড়া-সাঁকোর কালীপ্রসন্ন সিংহ, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা আর অর্থের আনুকূল্য না পেলে কলকাতার লোকের কাছে থিয়েটার হাজির হতো অনেক পরে। উদ্দেশ্য যা-ই থাক, আমরা দেখেছি একদল মানুষ বিলাস চরিতার্থ করতে আনন্দধারায় স্নাত হয়েছেন, আর বিনিময়ে আমরা পেয়েছি নতুন নতুন নাটক, নাট্যশালা আর কুশলী অভিনেতা।

সে-যুগে লোকের মুখে মুখে শোনা যেত ছাতুবাবু লাটুবাবুর নাম। ভালো নাম আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব। খেয়ালী বিলাসিতায় তাঁদের জুড়ি মেলা ভার ছিল, অকাতরে টাকা খরচ করতেন তাঁরা। সেসব খরচের কোনো হিসেব ছিল না। কালীপুজোর রাতে হাজার হাজার টাকার বাজি পোড়াতেন। সেই রেওয়াজ সীমিত হলেও এখনও চলছে। এখন যেখানে বিডন স্ট্রিট পোস্ট অফিস, সেখানে ছিল মস্ত বড়ো একটা মাঠ। সেই মাঠে প্রতিবছর শীতকালে বুলবুলির লড়াই হতো। লড়াইয়ের প্রধান দুই প্রতিযোগী ছিলেন পোস্তার রাজা নরসিংহ মল্লিক এবং ছাতুবাবু। সেই প্রবাদপুরুষ ছাতুবাবুর নাতি শরৎচন্দ্র ঘোষ ওই মাঠের একাংশে প্রতিষ্ঠা করলেন বেঙ্গল থিয়েটার। সেটা আঠারো শ' তিয়াত্তর সাল।

সেই বছরেই ছ'নম্বর বিডন স্ট্রিটে আর একটা সাধারণ রঙ্গালয় জন্ম নিল। তার নাম গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। মালিক বাগবাজারের এক ধনীর দুলাল। নাম ভুবনমোহন নিয়োগী। একথা আজ ভাবতে অবাক লাগে যে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খোলার সময়ে আইনের চোখে ভুবনমোহন সাবালক ছিলেন না। কলকাতা হাইকোর্টের নথিপত্র সেই কথাই বলে। কোনো নাবালকের পক্ষে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা এটাই বোধহয় এক এবং অদ্বিতীয় ঘটনা। পূর্বতন ন্যাশনাল থিয়েটারের সময় থেকেই ভুবনমোহন নাট্যামোদী ছিলেন। এবার এলেন প্রকাশ্যে। একেবারে পাদপ্রদীপের সামনে। ভুবনমোহনকে থিয়েটার খুলতে উৎসাহ দিয়েছিলেন তাঁর চার বন্ধু—অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও ধর্মদাস সুর।

ভুবনমোহনের বাবা বাগবাজারের নামকরা ধনী রাজেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী। কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রিটে প্রাসাদোপম বাড়ি। ঠাকুর্দা রসিকচন্দ্র নিয়োগীর নামে বাগবাজারের সুরম্য ঘাট। ভুবনমোহনের বাবা রাজেন্দ্র মারা যান আঠারো শ' আটষট্টি সালের সেপ্টেম্বর মাসে। রেখে গেলেন মা গোলকমণি, স্ত্রী রাখালমণি আর তিন ছেলে রামচন্দ্র, ভুবনমোহন ও হরিদাসকে। বড়ো ছেলে রামচন্দ্র তখন সদ্যবিবাহিত। ভুবনমোহন ও হরিদাস নাবালক। মৃত্যুর আগে রাজেন্দ্র কোনো উইল করে যেতে পারেননি।

রাজেন্দ্র নিয়োগীর দেহান্তরের মাত্র ন'দিন পরে তাঁর বড়ো ছেলে রামচন্দ্র হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা তখনও নাবালিকা এবং সন্তান-সম্ভবা। অন্নপূর্ণার বাবা পার্বতীচরণ সুর বেনারসে থাকতেন। মেয়ের বৈধব্যের শোকাবহ সংবাদ পেয়ে তিনি কলকাতায় ছুটে এলেন এবং মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে

গেলেন। পারলৌকিক ক্রিয়া মিটে যাওয়ার পর মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে সম্পত্তি ভাগের নালিশ করলেন। নিয়োগীদের বিশাল সম্পত্তির দরদাম ঠিক করার জন্যে আদালত থেকে দু'জন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হলেন। তাঁদের একজন নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এবং অপর জন কেদারনাথ বসু। মামলায় বাদী অন্নপূর্ণা। প্রতিবাদী গোলকমণি, রাখালমণি, ভুবনমোহন ও হরিদাস। আদালতের বিচারে মোটামুটি ঠিক হলো আপাতত গোলকমণি পাবেন এককালীন পাঁচ হাজার টাকা। অন্নপূর্ণা, ভুবনমোহন, হরিদাস ও রাখালমণি প্রত্যেকে রাজেন্দ্র নিয়োগীর সম্পত্তির এক-চতুর্থ সমান অংশে পাবেন। ভুবনমোহন ও হরিদাসের অভিভাবক হবেন রাখালমণি। তাছাড়া সম্পত্তির আয় থেকে গোলক-মণি মাসে পাবেন একশ'। অন্নপূর্ণার পক্ষে পার্বতীচরণ সুর আড়াই শ'। রাখালমণি আড়াই শ'। নাবালক ভুবনমোন ও হরিদাসের লেখাপড়া ও ভরণপোষণের জন্যে খরচ করা হবে মাসে পাঁচ শ' টাকা। কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রিটের বসতবাড়ি ছাড়াও চিৎপুর, চিৎপুর ঘাট রোড, বাগবাজার স্ট্রিট, শান্তিরাম ঘোষ স্ট্রিট, রামকান্ত বোস লেন, ক্রুকেড লেন ও সোনাগাছি লেনে ওদের সম্পত্তি ছিল। তাছাড়া নদীয়া চব্বিশ পরগনা ও বরিশালে ছিল বিস্তৃত জমিদারি। আজকের দিনে সেইসব সম্পত্তির দাম বোধ হয় কয়েক কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

এ তো গেল ভুবনমোহন নিয়োগীর পারিবারিক পরিচয়। এবার তাঁর থিয়েটারের কথায় আসা যাক। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খুলে তিনি তামাম কলকাতাকে চমকে দিলেন। আঠারো শ' তিয়াত্তর সালের একত্রিশে ডিসেম্বর থিয়েটারের উদ্‌বোধন হলো। অনুষ্ঠানে কলকাতার কেল্লার গোরা সৈন্যরা ব্যাণ্ড বাজিয়েছিল। অহঙ্কারে আত্মম্ভরিতায় ভুবনমোহন দিশাহারা। বিলাসের স্রোতে ভাসতে লাগলেন তিনি। তাঁর পয়সা ওড়ানোর ব্যাপারটা সে-যুগে ছিল একটা সংবাদ। শোনা যায়, ভুবন নিয়োগী প্রদীপের শিখায় দশ টাকার নোট জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতেন। মোসাহেবের কথায় মজে গিয়ে তিনি বহু ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো করেছিলেন। ঠাকুর ভাসানের শোভাযাত্রায় চিৎপুর রোডের বারবিলাসিনীদের তিনি হাজার জোড়া বেনারসী শাড়ি বিলিয়েছিলেন।

গ্রেট ন্যাশনালের জাঁকজমক দেখে বেঙ্গল থিয়েটারের শরৎচন্দ্র ঘোষ ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ভাবনায় পড়লেন। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে তাঁরা অভিনেত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা করলেন। এতদিন পুরুষদের দ্বারাই স্ত্রী ভূমিকা

কলকাতার রূপায়িত হতো। শরৎ ঘোষ মঞ্চের ইতিহাসে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন। নিষিদ্ধ পল্লী থেকে মঞ্চে এলেন গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী, জগত্তারিণী ও শ্যামা। বেঙ্গল থিয়েটারের এই নতুন ব্যবস্থা দেখে ভুবনমোহনও চুপ করে থাকেননি। টাকা ছড়িয়ে তিনি নিয়ে এলেন ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, কাদম্বিনী, হরিদাসী ও রাজকুমারীকে।

ইত্যবসরে ভুবনমোহন নিয়োগী সাবালক হয়েছেন। সেই মর্মে আদালত থেকে তিনি ছাড়পত্র পেয়েছেন। বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। বিলাসিতার সাগরে ভাসতে ভাসতে তিনি তখন এক স্বপ্নরাজ্যের রাজা। যে প্রবল উৎসাহ নিয়ে তিনি থিয়েটার চালু করেছিলেন, কিছুদিন পরেই তাতে যেন একটু ভাঁটা পড়ল। থিয়েটারের দিকে আর তেমন করে নজর দিচ্ছেন না। মন-মেজাজও ভালো নেই। ভুবনের নিরুৎসাহ হওয়ার একটা বড়ো কারণ ছিল পারিবারিক অশান্তি। মালিকের গাফিলতির জন্যে থিয়েটারে কর্মীদের মধ্যেও একটা ঢিলেঢালা ভাব এসেছে। আগের পরিবেশিত নাটক বিষবৃক্ষ এবং সতী কি কলঙ্কিনী পুরনো হয়ে গেছে। অনেক ভেবেচিন্তে মনোমোহন বসুর লেখা হরিশচন্দ্র নাটক খোলা হলো। কিন্তু ব্যবসা তেমন জমল না। সেই টালমাটাল অবস্থার মধ্যে ভুবনমোহনের মাথায় খেয়াল চাপল তাঁর দলকে নাটক পরিবেশনের জন্যে পশ্চিমে পাঠাতে হবে। গ্রেট ন্যাশনালের খ্যাতি শুধু কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ভারতের সুদূর প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে হবে তাঁর থিয়েটারের নাম। যে কথা সেই কাজ! গ্রেট ন্যাশনাল কয়েকখানি নাটক তৈরি করে ধর্মদাস সুরের ব্যবস্থাপনায় রওনা হলো ভারতের উত্তর-পশ্চিমে। সেটা আঠারো শ' পঁচাত্তর সালের মার্চ মাসের ঘটনা। দিল্লি, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, মীরাট প্রভৃতি শহরে নাটক অভিনয় করে তিনমাস পরে দল কলকাতায় ফিরে এল। সেই সফরে লাভ হওয়া দূরে থাক, বহু টাকা লোকসানের বোঝা ভুবনমোহনের মাথায় চেপে বসল। ধর্মদাস সুরের কাছে তিনি কৈফিয়ৎ চাইলেন, কারণ, ধর্মদাস ছিলেন দলের ম্যানেজার। তিক্ততা ক্রমশ চরম হয়ে উঠল। ভুবন-মোহন ধর্মদাসকে অ্যাটর্নির চিঠি দিলেন। ক্ষতিপূরণ দাবি করে বৌবাজারের বনেদি আটর্নি নবীনচাঁদ বড়াল অত্যন্ত কড়া ভাষায় ধর্মদাসকে লিখলেন, আমার মক্কেল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক ভুবনমোহন নিয়োগীর পরামর্শমত আপনাকে জানাই যে বাবু জানকীনাথ রায়ের কাছে প্রমিসরি নোট লিখে দিয়ে ভুবনমোহন আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তাছাড়া একটি সোনার হাতঘড়ি ও কিছু রূপোর বাসনপত্র আপনার কাছে জমা ছিল। চিঠি পাওয়ামাত্র টাকা ও

অন্যান্য জিনিস যেন ভুবনকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অ্যাটর্নির চিঠি পেয়ে ধর্মদাস অবাক। চিঠির বিষয়বস্তু তিনি কিছুই আন্দাজ করতে পারলেন না। শুধু এটুকু বুঝলেন তাঁকে চোর বদনাম দেওয়া হয়েছে। দুঃখে হতাশায় তাঁর মন ভেঙে গেল। থিয়েটারে যাওয়া তিনি আগেই বন্ধ করে দিয়েছেন। হতবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন এই অপবাদের কি জবাব দেবেন। কয়েকদিন পরে নবীনচাঁদ বড়ালের কাছ থেকে আবার একখানি চিঠি পেলেন। চিঠির বক্তব্য, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার হিসাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশ-গুলিতে আপনি যেসব শো করেছেন অবিলম্বে তার সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য হিসাব দাখিল করুন। এই চিঠি পাওয়ার চারদিনের মধ্যে যদি আপনি আয়-ব্যয়ের হিসাব না দেন তাহলে আর কোনো নোটিশ না দিয়েই আপনার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ধর্মদাস দেখলেন আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। ছুটলেন অ্যাটর্নি কেদার-নাথ মিত্রের কাছে। সব শুনে কেদারনাথ নবীনচাঁদের চিঠির সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন। ধর্মদাসের জবানীতে প্রথম চিঠির পাঁচ হাজার টাকা ও হাতঘড়ির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। পরের চিঠি সম্পর্কে তিনি লিখলেন: আমার মক্কেল ধর্মদাস সুর বিদেশ সফর সেরে কলকাতায় ফিরে এসেই আপনার মক্কেল ভুবন-মোহন নিয়োগীকে হিসাবপত্র বুঝিয়ে দিয়েছেন। কাশ্মীরের মহারাজা যে মূল্যবান শালখানি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারকে দিয়েছেন এবং অন্যান্য জায়গা থেকে যেসব উপহার সামগ্রী পাওয়া গেছে সবই ভুবনবাবুকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র থিয়েটারের স্টেজ এবং কিছু দৃশ্যপট এখনো লক্ষ্ণৌতে পড়ে আছে। সেগুলো ফিরে এলেই প্রত্যার্পণ করা হবে। তথাপি মিথ্যা অভিযোগ এনে আপনার মক্কেল যদি মামলা করেন তাহলে জানব সেটা তাঁর বিলাস।

চিঠি চালাচালির পরেও ভুবন নিয়োগী কোনো মীমাংসার পথে গেলেন না। ধর্মদাসের মান-ইজ্জত নিয়ে টানাটানির নেশা তখন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। পঁচিশ হাজার টাকা দাবি করে তিনি হাইকোর্টে নালিশ করলেন, সঙ্গে নানান অভিযোগ। আদালতে ভুবনমোহন বললেন, আঠারো শ' তিয়াত্তরের সেপ্টেম্বরে তিনি তাঁর প্রস্তাবিত থিয়েটার তৈরির কাজ দেখাশোনা করার জন্যে ধর্মদাস সুরকে ভার দিয়েছিলেন। এছাড়া মালপত্র কেনাকাটা ও থিয়েটারের জন্যে অভিনেতা নিয়োগ করার ক্ষমতাও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মাসিক মাইনে ছিল তিরিশ টাকা।

একত্রিশে ডিসেম্বর থিয়েটার চালু হওয়ার পর কোনো-এক সময়ে টিকিট বিক্রির হিসেব নিয়ে ধর্মদাসের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়। ভুবনমোহন তাঁকে বরখাস্ত করেন। আঠারশ' চুয়াত্তরের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধর্মদাস গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বিবাদটা আপসে মিটমাট হওয়ার পর ধর্মদাস আবার থিয়েটারে ফিরে আসেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে বিভিন্ন স্থানে নাটক পরিবেশনার জন্যে তিনি দল নিয়ে রওনা হন। বিদেশে নাটক পরিবেশনের ব্যাপারে ধর্মদাসের হাতে তিনি নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। অবশ্য তার কোনো রসিদ ছিল না। ভুবনের মতে বিদেশে গ্রেট ন্যাশনাল প্রচুর আয় করেছে। ধর্মদাস তার হিসাব নিকাশ দেননি।

ব্যাপারটা এতদুর গড়াবে ধর্মদাস ভাবতে পারেননি। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এই আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ব্যথিত তো বটেই। এই অপবাদ এই মিথ্যাচার তিনি মেনে নিতে রাজি নন। ভুবনমোহনের আনা অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বললেন, থিয়েটার-বাড়ি তৈরির দেখাশোনার ভার তাঁর ওপরে অবশ্যই ছিল। কিন্তু মালপত্র খরিদ করার ভার ছিল ভুবনের নিয়োগ করা লোক জয়কৃষ্ণ সেনের ওপর। থিয়েটারের টিকিট বিক্রির ব্যাপারে ধর্মদাসের কোনো ভূমিকা ছিল না। টিকিট বিক্রির দায়িত্ব ছিল বিহারীলাল চ্যাটার্জির ওপর এবং টাকাকড়ি নাড়াচাড়া করত জয়কৃষ্ণ সেন। টাকাপয়সার ব্যাপারে ধর্মদাসের কোনোই দায়দায়িত্ব ছিল না। আঠারো শ' চুয়াত্তরের মার্চে ভুবনমোহন গিরিশ ঘোষকে থিয়েটারে নিয়ে আসেন। তখন বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে প্রচণ্ড রেষারেষি। থিয়েটারের উন্নতি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে ভুবন গিরিশ ঘোষকে পাঁচ হাজার টাকা দেন। গিরিশবাবু তাঁর শ্যালক শ্যামপুকুরের দ্বারকানাথ দে'কে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তখন দ্বারকানাথ ও জয়কৃষ্ণ টিকিট বিক্রির ব্যাপার দেখতেন। ধর্মদাসের সেখানে কিছুই করার ছিল না। থিয়েটারে অভিনেতা নেওয়ার ব্যাপারেও তাঁর কোনো অধিকার ছিল না।

আঠারো শ' চুয়াত্তরের মাঝামাঝি গ্রেট ন্যাশনাল সাময়িক বন্ধ থাকে। সেই সময়ে ধর্মদাস রেল কোম্পানিতে অস্থায়ী চাকরি নিয়ে তাঁর অসুস্থ ভায়ের জায়গায় বহাল হয়ে মুঙ্গেরে চলে যান। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ভুবন নিয়োগী চিঠি লিখে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। থিয়েটারকে তিনি বড়ো ভালবাসতেন। চাকরির চেয়ে থিয়েটারের আকর্ষণটা তাঁর কাছে ছিল অনেক বড়ো। মুঙ্গের ছেড়ে ধর্মদাস

কলকাতায় চলে এলেন। ভুবনমোহন একটা লিখিত চুক্তিতে তাঁকে স্টেজ ম্যানেজার নিযুক্ত করলেন। সেই চুক্তিপত্রে সাক্ষী হিসেবে সই করেছিলেন রাধামাধব কর ও মহেন্দ্রনাথ বসু। তখন সপ্তাহে মাত্র একদিন থিয়েটার হতো। বুকিং অফিসের ভারপ্রাপ্ত দু'জন ছিলেন জয়কৃষ্ণ সেন ও মতিলাল বিশ্বাস। তাঁরাই টিকিট বিক্রি করতেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারকে ভুবনমোহন বিদেশে পাঠিয়েছিলেন নিজের খেয়াল চরিতার্থ করতে। দলের ম্যানেজার ছিলেন নীলমাধব চক্রবর্তী। ধর্মদাসের হাতে পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে বিদেশে যা-কিছু টাকা তাঁর হাত দিয়ে খরচ হয়েছিল, ফিরে এসে তিনি সব হিসেব ভুবনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, লাহোরে ব্যাঙ্কে পাঁচ শ' টাকা পড়ে আছে। থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম হাওড়া স্টেশনের মালগুদামে পড়ে আছে একথাও ভুবনমোহনকে জানানো হয়েছে। ভুবনমোহন যে হাতঘড়ি ফেরত চেয়েছেন সেটা তিনি ধর্মদাসকে তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে উপহার দিয়েছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এত কথার পরেও মামলার শুনানীর সময়ে ধর্মদাস সুর কোর্টে হাজির হলেন না। আঠারো শ' ছিয়াত্তরের জানুয়ারির পাঁচ তারিখে বিচারপতি জন ধাড ফিয়ারের কাছে মামলাটা একতরফা নিষ্পত্তি হয়ে গেল। আদেশ হলো মামলার খরচ সমেত ধর্মদাস ভুবনমোহনকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন এবং জেনেভা হাতঘড়িটি প্রত্যার্পণ করবেন।

ভুবনমোহন নিয়োগীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ধর্মদাস সুর চলে গেলেন বেঙ্গল থিয়েটারে। শরৎ ঘোষ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। ধর্মদাসের মঞ্চপরিকল্পনায় নতুন করে শুরু হলো বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক পুরুবিক্রম। ওদিকে ভুবনমোহনও নতুন উদ্যমে থিয়েটারে মন দিলেন। অমৃতলাল বসুর হীরক-চূর্ণ ও উপেন্দ্রনাথ দাসের সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের অভিনয় শুরু হলো।

হীরক-চূর্ণ অমৃতলালের লেখা প্রথম নাটক। সে-সময়ে বরোদার রাজা ছিলেন মলহররাও গাইয়োকোয়াড়। স্থানীয় ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল ফিয়ারকে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বিশেষ আদালতে সেই অভিযোগের বিচার করে মলহররাওকে গদিচ্যুত করা হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই হীরক-চূর্ণ নাটক। নাট্যকার হিসাবে প্রথম নাটকেই অমৃতলাল স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। অমৃতলালের ছেলেবেলা

কেটেছিল শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ির সামনের এক বাড়িতে। কলকাতার গ্রে স্ট্রিট তখনও তৈরি হয়নি। ওই অঞ্চলের অনেকখানি জায়গা অনুন্নত ছিল। তবু সে-যুগে সারা উত্তর কলকাতা জুড়ে একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। ছাত্রজীবনে কিছুদিন বেনারসে থাকার সময়ে সেখানকার কুইন্স কলেজের লাইব্রেরিয়ান রামচন্দ্র সান্যালের শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য দেখে তিনি মুগ্ধ হন। সেখানেই নাট্যে, সাহিত্যে আর সুকুমার কলায় তাঁর অনুরাগের শুরু। বেনারসে থাকতেই উপেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে বন্ধুত্ব। উপেন্দ্রনাথের বাবা শ্রীনাথ দাস ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রখ্যাত উকিল। যাই-হোক, কলকাতায় এসে অমৃতলাল তাঁর জীবনের সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর সফল নাটক হীরক-চূর্ণ গ্রেট ন্যাশনালকে পয়সা ও সম্মান দুই-ই দিয়েছিল। মলহওরাও-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ও অ্যাডভোকেট জেনারেলের ভূমিকায় অমৃতলাল নিজে।

কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর হীরক-চূর্ণ নাটকের ওপর সরকারের নজর পড়ল। ব্রিটিশ সরকার সেই প্রথম ভাবতে শুরু করল যে নাটক আর কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদের মাধ্যম নয়। নাটক গণচেতনা জাগিয়ে তোলার হাতিয়ারও বটে। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে দেশে প্রচলিত আইন না থাকায় সরকারকে সেদিন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে হয়েছিল।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে পরিবেশিত অপর নাটক উপেন্দ্রনাথ দাস বিরচিত সুরেন্দ্র-বিনোদিনী ছিল একটি ব্যাঙ্গাত্মক প্রহসন। ম্যাক্রেণ্ডেল নামে একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে সেই নাটকে একটি কামুক অসাধু চরিত্রে চিত্রিত করা হয়েছিল। এই নাটক প্রশংসা যেমন পেয়েছিল, বিরূপ সমালোচনাও সহ্য করেছিল। সেকালের মধ্যস্থ পত্রিকার সম্পাদক নাট্যকার মনোমোহন বসু লিখলেন : যখন বড় বড় কয়েকজন সম্পাদক এই নাটকের সুখ্যাতি বর্দ্ধনে দশহস্ত হইয়াছেন, তখন আমাদের ক্ষুদ্র লেখনীর কথা আর কোথায় লাগিবে ?... যাহা হউক, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের যত সুখ্যাতি লিখিয়াছেন, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহা এত প্রশংসার বস্তু বলিয়া বোধ হইল না। ভগ্নীর প্রেম লইয়া ভ্রাতা-সম্পর্কীয় বাঙ্গালী যুবক কস্মিনকালে এমন খেলা খেলে নাই, খেলিবেও না এবং খেলিতে দেওয়া উচিত নয়। আবার, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, সেরূপ ম্যাজিস্ট্রেট একালে ত দৃষ্ট হয় না। চিত্রটি

আংশিক সত্য হইতে পারে, অপর সকল অংশ অবশ্যই অতিবর্ণনা। নিতান্ত ইংরেজদ্বেষ্টা না হইলে এমন অযথা বর্ণনায় কেহ সন্তোষ লাভ করিতে পারে না। ··· এইসব বলাতে আমাদের এমন অভিপ্রায় নয় যে সুরেন্দ্র-বিনোদিনী কেবলই দোষপূর্ণ নাটক। ইহাতে কোনো অঙ্গে গুণও যে আছে আমরা স্বীকার করি। আবার যখন লিখিবেন, অসামাজিক ও অস্বাভাবিক বর্ণনার দোষগুলি পরিমার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন।

বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্বেও সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক সেকালের দর্শকরা নিয়েছিল। মুখ্য স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছিল গোলাপসুন্দরী। কিন্তু অলক্ষ্যে রাজরোষে পড়েছিল সুরেন্দ্র-বিনোদিনী। কিছুটা অশ্লীলতার দায়ে এবং কিছুটা রাজার জাতের সমালোচনায়।

এখানে সঙ্গত কারণেই গোলাপসুন্দরীর কথা এসে যায়। কলকাতার থিয়েটারে সেকালে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রথম যারা এগিয়ে আসেন, গোলাপসুন্দরী তাদেরই একজন। উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ সরোজিনী নাটকে সুকুমারীর চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়ের পর গোলাপ নতুন পরিচিতি পায় সুকুমারী নামে। উপেন দাসের চেষ্টায় গোষ্ঠবিহারী দাস নামে এক সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে সুকুমারীর বিয়ে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে সুখের হয়নি। একটি কন্যার জন্মের পর গোষ্ঠবিহারী অভিনয়ের জগৎ ছেড়ে বিলেতে চলে গেলেন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে। নিদারুণ দুর্দশায় পড়ে সুকুমারী আবার ফিরে এসেছিল রঙ্গমঞ্চে।

আঠারো শ' পঁচাত্তর সালে শীতের মরশুমে প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে এসে পৌঁছালেন। সারা কলকাতায় তখন অভাবনীয়-ঝাঁকজমক। যুবরাজের সম্বর্ধনার জন্যে সে সময়ে প্রচুর টাকা খরচ হয়েছিল। অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে দিকে দিকে প্রতিবাদের ঝড়ও উঠেছিল। কিন্তু কোনো প্রতিবাদই উৎসবের সমারোহকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। যাই হোক, সেই সুযোগে কলকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। যুবরাজ তা সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে জগদানন্দবাবুর বাড়িতে শাঁখ বাজিয়ে, গলায় ফুলের মালা দিয়ে বাড়ির মেয়েরা যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানাল। এই ঘটনা সেদিন সারা কলকাতাকে এক নতুন রসের আস্বাদ দিয়েছিল। ১২৮২ বঙ্গাব্দের ২৮ পৌষ ও ৫ মাঘ সুলভ সমাচার পত্রিকা রসাল সংবাদ পরিবেশন

করল। ২৮ পৌষ : হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে একদিন যুবরাজ পায়ের ধূলা দিয়াছেন।... অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু মহিলাদিগকে রাজদর্শন করাইবার জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় যুবরাজকে অনুরোধ করেন। স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইংরাজের একটি বিশেষ গুণ। সেদিন অনেকগুলি স্ত্রী ও বালিকা তথায় একত্রিত হইয়া যুবরাজকে ফুল, দূর্ব্বা, ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। যুবরাজের সঙ্গে ভূপালের বেগমও উপস্থিত ছিলেন। প্রধান রাজপুরুষ বা রাজপ্রতিনিধির নিকট হিন্দু কুলবধূরা বাহির হইতে বিন্দুমাত্র ভয় করে না, লজ্জা করিয়া লুকাইয়াও থাকে না। ইহা একটি স্ত্রী স্বাধীনতার লক্ষণ। ডাক্তার ফ্রেয়ার উভয়ের কথা উভয়কে বুঝাইয়া দেন। প্রায় দশ পনের হাজার টাকার দ্রব্যাদি উপহার দেওয়া হইয়াছে। ছোটলাট ও হগ সাহেবের পত্নী, বড়লাট সাহেবের কন্যা, আরও কয়েকটি বিবি তথায় উপস্থিত ছিলেন। যুবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছেন, এমন সমাদর কোথাও পাই নাই। দেশে গিয়া জননীকে এ কথা বলিব। মুখুজ্জে মহাশয় এ বুদ্ধিটি বার করেছেন মন্দ নয়। কিন্তু একটু বেমানান হইয়াছে। যা হউক, একজন প্রজার সন্মানে আমরা সকলে সম্মানিত হইয়াছি।

অতঃপর সুলভ সমাচার ৫ মাঘ তারিখে আবার লিখল : উকিল জগদানন্দবাবু যুবরাজকে বাড়িতে আনিয়া মেয়েদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ করাইয়া দিয়া এখন বড় বিপদে পড়িয়াছেন। একে বামুনের ছেলে, তাতে আবার ধর্মরক্ষিণী সভার প্রধান সভ্য। এ অবস্থায় হিন্দু কুলললনা দিগকে ভিন্নদেশীয় রাজার নিকট বাহির করাতে তাঁহাকে সকলে যেন কেচাখেউ করিয়া ধরিয়াছে। ইংরাজী কাগজওয়ালারা, কেহ নির্বোধ কেহ জেঁকো, নানা কথা বলিতেছে। কেহ বলেন কলিকাতা ভবানীপুরের বড় বড় ভদ্র পরিবারের মেয়েরা সভায় উপস্থিত ছিল। কেহ বলিতেছেন, কতকগুলি ইতর স্ত্রীলোককে সাজাইয়া বাহির করা হইয়াছিল। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পর্য্যন্ত ইহাতে বিমত প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাকেই বলে পুরাতন পাত্রে নূতন মদ ঢালা। যাক, ভদ্রলোক বুঝিতে না পারিয়া একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য আর এত চাপাচাপি কেন?

সংবাদপত্রের কটাক্ষ ছাড়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরো কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। শ্যামবাজার হায়ার গ্রেড স্কুলের শিক্ষক ব্রজলাল সাহা যুবরাজ আগমন নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমিক কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাজীমাৎ শীর্ষক একটি বাংলা কবিতা রচনা করেন যার শুরুটা হলো :

বেঁচে থাক মুখুজ্জের পো খেল্লে ভাল বটে
তোমার খেলায় রাং রুপো হয় গোবরে শালুক ফোটে।

জগদানন্দের যুবরাজ সম্বর্ধনা নিয়ে নাট্যশালাও সোচ্চার হয়ে উঠল। গ্রেট ন্যাশনালের উপেন্দ্রনাথ দাস একটি প্রহসন রচনা করলেন। নাম দিলেন গজদানন্দ। আঠারো শ' ছিয়াত্তর সালের উনিশে ফেব্রুয়ারি সেই প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হলো। অভিনয় দেখে হাসির হুল্লোড়ে কলকাতা শহর তোলপাড়। উকিল জগদানন্দ ক্ষেপে আগুন। ওপর মহলে তিনি নালিশ জানালেন। তখন সরকারের তরফে উচ্চপদস্থ কিছু লোক নাটকটি দেখলেন। নাটকটি রাজরোষে পড়ল। কলকাতা পুলিশের হস্তক্ষেপে গজদানন্দের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু গ্রেট ন্যাশনাল দমে যাওয়ার পাত্র নয়। নাটকের কিছু অংশ অদল বদল করে নাম পাল্টে হনুমান চরিত নামে আবার সেটি তারা দর্শকদের সামনে হাজির করল। দুর্ভাগ্যের কথা, সেই অভিনয়ও পুলিশ বন্ধ করে দিল।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রযোজক ভুবনমোহন নিয়োগী এবং অভিনেতারা তখন বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। একের পর এক নাটকে পুলিশের হামলায় তাঁদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। মরিয়া হয়ে পুলিশ কমিশনার মিস্টার ল্যামবার্টকে কটাক্ষ করে আর-একখানি নাটক তাঁরা পরিবেশন করলেন। নাটকের নাম দি পুলিশ অফ পিগ অ্যাণ্ড শিপ। ক্ষিপ্ত ইংরেজ সরকার সে-নাটকের অভিনয়ও বন্ধ করে দিল। শাসকের শাসনে একের পর এক নাটকের অভিনয় বন্ধ হওয়ায় গ্রেট ন্যাশনাল প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলো। তবুও নতুন উদ্যমে তারা শুরু করল সতী কি কলঙ্কিনী ও স্বরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের নিয়মিত অভিনয়।

আঠারো শ' ছিয়াত্তর সালের মার্চের চার তারিখ। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে তখন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সতী কি কলঙ্কিনী নাটকের অভিনয় চলছে। পুলিশ কমিশনার এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন থিয়েটারে। দর্শকরা হতচকিত। ঘটনার আকস্মিকতায় নট-নটীরা সংলাপ ভুলে গেল। ভয়ে তটস্থ সবাই। পুলিশের অভিযোগ, ইতিপূর্বে স্বরেন্দ্র-বিনোদিনী নামে যে নাটক অভিনীত হয়েছিল সেটি অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট। সেই কারণে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে সেই নাটকের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। সে রাত্রে গ্রেপ্তার হলেন পরিচালক-নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্ন্যাল, অভিনেতা মতিলাল সুর, বেলবাবু এবং আরো কয়েকজন। পরের দিন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট

ডিকেন্সের এজলাসে তাঁদের হাজির করা হলো। কয়েকজন গণ্যমান্য লোক অশ্লীলতার পক্ষে ও বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হাইকোর্টের প্রধান দোভাষী মিস্টার ওয়েন, প্রধান অনুবাদক শ্যামাচরণ সরকার, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, আর্যদর্শন পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং আরো কয়েকজন। শুনানীর পর ম্যাজিস্ট্রেট ডিকেন্স উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসুকে দোষী সাব্যস্ত করে একমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। বাকিরা বেকসুর খালাস।

এই অভাবনীয় সাজার বিরুদ্ধে নাট্যজগতে ও কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে বিক্ষোভ ঘনীভূত হয়ে উঠল। ভুবন নিয়োগীর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে অভিযুক্তদের দিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে আপীল করলেন। উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের পক্ষে অ্যাটর্নি ছিলেন গণেশচন্দ্র চন্দ্র। তাঁদের পক্ষে হাইকোর্টে সওয়াল করেছিলেন ব্যারিস্টার মিস্টার ব্যানসন, মনমোহন ঘোষ ও তারকনাথ পালিত। দু'জন বিচারপতি জন ফিয়ার ও উইলিয়ম মার্কবির কাছে অভিযোগের পুনর্বিচার হলো। বিচারে আসামীরা নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। সসম্মানে মুক্তি পেলেন উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল। ভুবন নিয়োগীর মুখে জয়ের হাসি।

এই শোচনীয় পরাজয়ে সেদিনের ইংরেজ সরকার প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। ফলে প্রশাসন মরিয়া হয়ে উঠল। তারা তখন দমননীতির অন্য উপায় খুঁজতে লাগল। নাটকের পরিবেশনকে কায়দায় আনার জন্যে একটা খসড়া বিল তৈরি হলো। ড্রামাটিক পারফরম্যান্স কন্ট্রোল বিল অর্থাৎ নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল। সেদিন তার প্রতিবাদে কলকাতার মাঠে-ঘাটে ও মঞ্চে কিছু কিছু সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তা প্রতিরোধ করা যায়নি। আঠারো শ' ছিয়াত্তর সালের সতেরো ডিসেম্বর সেই কুখ্যাত বিলটি বড়োলাটের অনুমোদন লাভ করে।

পর পর কয়েকটা নাটকে রাজরোষ পড়ার জন্যে ভুবনমোহনের প্রচুর লোকসান হলো। সেইসব নাটকের অভিনয়ের জন্যে সাজসরঞ্জাম আসবাবপত্র পোশাক-পরিচ্ছদের পেছনে যে টাকা তিনি খরচ করেছিলেন সবটাই বৃথা গেল। তাছাড়া পুলিশ কোর্ট ও হাইকোর্টে মামলা লড়তে বড়ো বড়ো উকিল ব্যারিস্টারের পেছনে জলের মতো টাকা খরচ করেছিলেন তিনি। ভুবন মনে করতেন যেখানে তাঁর সম্মান আর মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত সেখানে টাকার কথাটা নিতান্তই গৌণ। বাগবাজারের

রসিক নিয়োগীর নাতি বলে তাঁর একটা গর্ব ছিল। কোন প্রতিকূল অবস্থাকেই মানতে চাইতেন না তিনি। ভুবনমোহন ছিলেন এমনই এক রাজ্যের রাজা যাঁকে আগামী কালের কোনো চিন্তা স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি জানতেন বর্তমান। আজকে যা করার কর, কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার চলবে, টাকার জন্যে কেউ ভেব না।

শেষপর্যন্ত থিয়েটার চালাতে গিয়ে টাকায় টান পড়ল। টাকা নিয়ে মা রাখালমণির সঙ্গে ভুবনমোহনের বিরোধ বাধল। নগদ টাকা ভুবন যা পেয়েছিলেন তার প্রায় সবটাই খরচ হয়ে গেছে। দু'বছর হয়ে গেল তিনি সাবালক হয়েছেন। এই দু'বছর পৃথিবীটাকে চিনতে তাঁকে অনেক দাম দিতে হয়েছে। বিষয়-সম্পত্তি তিনি তখনও সম্পূর্ণ বুঝে নিতে পারেননি। বেশিটাই ছিল যৌথ। তবু বাইরের লোক জানত সেই রাজার ছেলেকে টাকা দিলে মার যাবে না। তাই দেনা করার দরজা তাঁর কাছে খোলা ছিল। গজদানন্দ নাটক শুরু করার সময়ে শোভাবাজারের মাণিক্যমণি চৌধুরাণীর কাছে ভুবন টাকা ধার করেছিলেন। টাকার পরিমাণ তিন হাজার। কিন্তু শোধ দেওয়ার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি। মাণিক্যমণি হাইকোর্টে নালিশ করলেন। ভুবনমোহন নোটিশ পেয়েও গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। ব্যাপারটার কোনোই গুরুত্ব দিলেন না তিনি। বিচারপতি জন বাড ফিয়ারের এজলাসে মামলা একতরফা ডিক্রি হয়ে গেল। এছাড়া আরও দু'-একটা মামলা ভুবনমোহন অবহেলা করায় আসল ও সুদের দায়দায়িত্ব তাঁর ওপর চেপে গেল। এক জায়গায় টাকা শোধ করতে ভুবনমোহন তখন অন্য জায়গায় ধার করে চলেছেন। তেমনই এক ধারের মাশুল দিতে ভুবনমোহন নিয়োগী বিপাকে পড়লেন।

ভাগ্যকুলের জমিদার শ্রীনাথ রায়, সীতানাথ রায় ও জানকীনাথ রায়। কলকাতার শোভাবাজারে বাড়ি। দর্মাহাটায় গদি। সে যুগের বাবুমশায়ের কলকাতার অনেক বাবু ওদের তেজারতি ব্যবসার গদিতে পা দিয়েছিলেন। ভুবনমোহনও বাদ যাননি। কয়েকখানা হাতচিঠিতে তিনি প্রায় পনেরো হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। আসল বা সুদ কিছুই দিতে পারেননি। রায়েরা ভুবনের নামে হাইকোর্টে নালিশ ঠুকে দিলেন। কোনো সূত্র থেকে তাঁরা জানতে পেরেছেন যে সম্প্রতি ভুবনমোহন অ্যাটর্নি অতেন্দ্রপ্রকাশ গাঙ্গুলীর কাছে বেশ কয়েকটি সম্পত্তি বন্ধক রেখে তিরাশি হাজার টাকা ধার করেছেন। সুতরাং এখনই যদি ভুবনমোহনের বাকি সম্পত্তি আটক করা না যায় তাহলে তাদের সব টাকাটাই জলে পড়বে। আদালতের

কাছে তাঁরা ভুবনমোহনের দায়শূন্য সম্পত্তির তালিকা দিলেন। সেই তালিকার কয়েকখানা বাড়ির সঙ্গে ছিল ভুবনমোহনের সাধের গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার এবং দুটি ঘোড়ার গাড়ি।

হাইকোর্টে হাজির হয়ে ভুবনমোহন নিয়োগী স্বীকার করলেন যে, রায়েদের কাছে সত্যিই তিনি টাকা নিয়েছেন কিন্তু এই মুহূর্তে তা পরিশোধ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। আর্থিক অনটন ছাড়াও নানারকম মানসিক অশান্তিতে তিনি ভুগছেন। টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে দু'বছর ধরে মায়ের সঙ্গে তাঁর চরম অশান্তি চলছে। তাঁর মা রাখালমণি বসতবাড়ি ছেড়ে ছোটো ছেলে হরিদাসকে নিয়ে গোঁসাইবাগান লেনে একটা ভাড়া বাড়িতে চলে গেছেন। মায়ের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের মূল কারণ টাকা। মা রাখালমণি ভুবনমোহনের মুখ দেখতে চান না। ভুবন কোর্টে দাঁড়িয়ে একটা নতুন চাল চাললেন। বললেন, আমি আর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক নই। থিয়েটার আমি আমার ঠাকুমা গোলকমণি দাসীকে বিক্রি করে দিয়েছি।

বিচারপতি চার্লস পন্টিফেক্স ভুবনমোহনের বিরুদ্ধে মামলার রায় দিলেন। তারিখটা ছিল আঠারো শ' ছিয়াত্তর সালের সাতাশে নভেম্বর। ভুবনকে দিতে হবে পনেরো হাজার আট শ' চব্বিশ টাকা। একমাস পরে ভুবনের ব্যক্তিগত মালিকানার একাধিক বাড়ি নীলামের আদেশ হলো। তখন ভুবনমোহনের সম্পত্তি বলতে কলকাতার পাঁচখানা বাড়ির অবিভক্ত অংশ এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। কিন্তু সবকিছুই এমনভাবে জড়ান ছিল যে সেসব বিক্রি করতে খুবই অসুবিধায় পড়তে হলো। রায়েরা ভাবলেন তবে কি সব টাকাটাই মার খাবে ? না। পুরো টাকাটাই তাঁরা পেয়েছিলেন। কড়ায় গণ্ডায় ভুবন টাকা শোধ করলেন। শ্রীনাথ রায়ের কাছে ভুবনমোহনের আরো পঞ্চাশ হাজার টাকার দেনা ছিল। সিকিউরিটি হিসাবে তিনি কয়েকটি বাড়ির দলিল জমা রেখেছিলেন। সে টাকাও তিনি শোধ দিলেন। টাইট্ল ডীডগুলো ফেরত নিলেন। দায়মুক্ত হলো সম্পত্তি। মুক্তি পেল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার।

একটা বড়ো ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়ে ভুবনমোহন চাইছিলেন বেশ কিছুদিন শান্তিতে থাকতে। থিয়েটারের সম্পর্ক তখন আর তাঁর ভাল লাগছিল না। রঙ্গালয়ে এলে পাওনাদারেরা বিরক্ত করবে সেটা সহ্য করা কষ্টকর। এতদিন নিজে থিয়েটার চালাতে গিয়ে তিনি দেখেছেন আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। তাই তিনি যোগ্য

কারোর হাতে থিয়েটারের ভার দিতে চাইছিলেন। ভুবনের মনোভাব জানতে পেরে গিরিশ ঘোষ এগিয়ে এলেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দেওয়ার পর বেশ কিছুদিন তাঁর কেটে গেছে। তিনি গ্রেট ন্যাশনাল হাতে নিয়ে সেটা চালাবার প্রস্তাব দিলেন। ভুবনমোহন রাজি হয়ে গেলেন। আঠারো শ' সাতাত্তর সালের সাতাশে জুলাই তারিখে একটা চুক্তিপত্রে সই করে ভুবনমোহন গিরিশ ঘোষকে থিয়েটার লীজ দিলেন। গিরিশ এখন আর শুধুমাত্র নট রইলেন না। থিয়েটারের লেসী হলেন। বলতে গেলে একরকম মালিক। থিয়েটার হাতে নিয়ে তিনি গ্রেট কথাটা ছেঁটে ফেললেন। বেঙ্গল থিয়েটার থেকে বিনোদিনীকে নিয়ে এলেন। মেঘনাদ বধ নাটক মঞ্চস্থ হলো। এই নাটকেই প্রমীলার চরিত্রে অভিনয় করে বিনোদিনী দর্শকদের কাছে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। সে-নাটকে অন্যান্য স্ত্রী চরিত্রে ছিলেন কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি ও বসন্তকুমারী। বেঙ্গল থিয়েটার তখন গ্রেট ন্যাশনালের এই নবরূপান্তর দেখে আড়ালে হেসেছিল। থিয়েটার ছেড়ে ভুবনমোহনের পালিয়ে যাওয়াটায় তারা খুব রস উপভোগ করেছিল। ভুবন-মোহনকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভরা একটা প্রহসন তারা মঞ্চস্থ করল। প্রহসনটির নাম আয় ঘুরে আয় সোনার চাঁদ। সমসাময়িক পত্রপত্রিকা তাদের এই তামাশাটা মোটেই ভাল চোখে দেখেনি। ভুবনমোহনও তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। যাই হোক, গ্রেট ন্যাশনালের ভাঙা হাটে সাড়া জাগাতে গিরিশ ঘোষ মন দিলেন। পর্যায়ক্রমে নাটক অভিনীত হলো পারিজাত হরণ, প্রণয় কানন, সরোজিনী, কৃষ্ণ-কুমারী প্রভৃতি। ধর্মদাস সুর তখন বেঙ্গল ছেড়ে আবার ফিরে এসেছেন ন্যাশনাল থিয়েটারে।

ন্যাশনাল থিয়েটারের লেসী হিসাবে গিরিশ ঘোষ একটা বছর কাটিয়ে দিলেন কিন্তু বিশেষ কোনো উন্নতি করতে পারলেন না। তার একটা প্রধান কারণ থিয়েটার বাড়িতে ক্রমাগত পাওনাদারদের হামলা। গিরিশ ঘোষের ভাই অতুলকৃষ্ণ ঘোষ হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। থিয়েটার সম্পর্কে গোলমালের কথা তিনি সবিশেষ জানতেন। আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করে তিনি দাদাকে অনুরোধ করলেন থিয়েটার চালানো থেকে সরে দাঁড়াতে। ভাইয়ের কথায় রাজি হয়ে গিরিশ ঘোষ লীজ ছেড়ে দিলেন এবং শুধুমাত্র অভিনেতা হিসাবেই ন্যাশনালে রয়ে গেলেন। তখন ভুবনমোহন নিয়োগী কেদারনাথ চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোককে নতুন করে থিয়েটার লীজ দিলেন। এই চুক্তি হয়েছিল আঠারো শ' আটাত্তরের ডিসেম্বর মাসে। কেদারনাথ চৌধুরীর বাবা রাজকিশোর চৌধুরী সেকালের একজন নামকরা

জমিদার ছিলেন। ডায়মণ্ড হারবারে তাঁদের জমিদারি ছিল। কেদারনাথ নতুন উদ্যমে গ্রেট ন্যাশনালের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আমার জন্যে সচেষ্ট হলেন।

আঠারো শ' আটাত্তর সাল। একের পর এক মামলায় ভুবনমোহন নিয়োগী দিশা-খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রকাশ্যে তাঁর থিয়েটার বাড়িতে আসা তখন আর সম্ভব হচ্ছে না। তবুও থিয়েটারের নেশা তিনি কাটাতে পারছেন না। তখনও তিনি স্বপ্ন দেখে চলেছেন। থিয়েটারের শখ মেটাতে তিনি অনেক খুইয়েছেন। আরো খোয়াতে বসেছেন। যখন ইচ্ছে হয়েছে, কিছু না ভেবেই তিনি টাকা ধার করেছেন। সুদের হার যত চড়াই হোক তিনি পরোয়া করেননি। তিনি কোনোদিন ভাবেননি লক্ষ্মী চঞ্চলা। যে তাঁকে ধরে রাখতে পারে তিনি তার ঘরে বাঁধা থাকেন। নইলে পলায়নপরা সেই দেবী দূরে চলে যান। ভুবনমোহনের কাছ থেকেও দেবী দূরে সরে গিয়েছিলেন। অনেক দূরে। নাগালের বাইরে।

কেদারনাথ চৌধুরীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল থিয়েটার গতানুগতিক ভাবে চলছিল। চলছিল শুধুমাত্র গিরিশ ঘোষের আকর্ষণেই। জনসমাগম অব্যাহত ছিল। ওদিকে বেঙ্গল থিয়েটার তখন জোর কদমে চলছিল। তারা বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর মঞ্চস্থ করল। নামভূমিকায় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপ হরি বোস্টম, স্ত্রী চরিত্রে এলোকেশী কুসুমকুমারী ও দলনীর ভূমিকায় বনবিহারিণী।

থিয়েটার থেকে দূরে সরে থেকেও ভুবনমোহন স্বস্তি পেলেন না। মামলা তাঁকে ধাওয়া করে ফিরতে লাগল। বিলাসিতার মূল্য দিতে চরম অপমান সহ্য করতে হলো সেদিনের সেই রাজার দুলালকে।

কলকাতায় মোটর গাড়ির যুগ তখনও আসেনি। সৌখিন বাবুরা চড়তেন সুদৃশ্য ঘোড়ার গাড়ি। যার নাম জুড়ি, ল্যাণ্ডো ও ফিটন। তখনকার ডাল-হাউসি, লালবাজার ও কসাইটোলায় বেশকিছু ঘোড়ার গাড়ির ব্যবসাদার ছিল। উনত্রিশ নম্বর ওয়াটার্লু স্ট্রিটে এমনি এক সংস্থা ছিল যার নাম মেসার্স ডাইক্‌স অ্যাণ্ড কোম্পানি। তাদের তিনজন বিদেশি অংশীদারের নাম রিজেস, বারনার্ড ও রীড। ভুবনমোহন তাদের কাছে একটা জুড়ি গাড়ি কিনেছিলেন। নগদ টাকা তিনি দেননি। তিনি ও তাঁর এক বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি গাড়ির দাম বাবদ সতেরো শ' টাকার হাতচিঠি লিখে দিয়েছিলেন। গাড়ি কেনার তারিখ আঠারো শ' সাতাত্তর সালের পনেরো আগস্ট। এক বছর তাগাদা করেও ডাইক্‌স কোম্পানি টাকা আদায় করতে পারল না। ইতিমধ্যে অপর একটি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বন্দী হয়েছেন জেল হাজতে। ডাইকৃস কোম্পানী ওদের নামে হাইকোর্টে নালিশ ঠুকে দিল। ভুবনমোহনের ওপর সমন জারী হলো। জেলখানায় বসে সমন পেলেন জ্ঞানেন্দ্র ব্যানার্জি। ভুবনমোহন তখন মানসিক-ভাবে এমনই বিপর্যস্ত যে তিনি কোর্টে হাজির হলেন না। তাছাড়া কোর্টে হাজির হওয়ার মতো টাকা তাঁর কাছে ছিল না। আক্ষরিক অর্থে তিনি তখন নিঃস্ব।

মামলার ডাক হলো। ভুবনমোহন অনুপস্থিত। মামলা একতরফা ডিক্রি হয়ে গেল বিচারপতি জেমস সিউএলের এজলাসে আঠারো শ' আটাত্তর সালের সতেরোই জুন তারিখে। জ্ঞানেন্দ্র ব্যানার্জি জেল খাটছেন বলে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। ভুবনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হলো। অনেক খোঁজার পর আগষ্ট মাসের ন' তারিখে কলকাতার শেরিফ তাঁকে আদালতে হাজির করলেন। অর্ধোন্মাদ ভুবন তখন বাঁচার জন্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। বিচারপতি ব্রাউটন তাঁকে ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। হাজতে প্রতিদিন চার আনা হিসাবে জলপানির ব্যবস্থা। সত্যি, ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! কলকাতার পেশাদারী রঙ্গালয়ের অন্যতম পথিকৃৎ অভিজাতবংশীয় নাট্যরসিক ভুবনমোহন নিয়োগীর নাম চিরকালের জন্য মসীলিপ্ত হয়ে গেল।

সে-যুগের আইন ছিল অন্যরকম। অনাদায়ী টাকার জন্যে জেল খাটানোর শাস্তি দেওয়ার পরেও সে-টাকা আদায় করা যেত। এই ঘটনার দীর্ঘ ছ' বছর পরে ডাইকৃস কোম্পানী ১৮১ চিৎপুর রোড ও ৭৬ রামকান্ত বোস স্ট্রিটের দু'টি বাড়ির ভুবনমোহনের অংশ ক্রোক করে। ভুবনমোহন তাদের পাওনা টাকা শোধ করে দেন। তখন টাকার অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল প্রায় চার হাজার।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার এক অভিশপ্ত নাট্যশালা। উদ্বোধনের দিন এই নাট্যশালায় আগুন লেগেছিল। ক্ষয়-ক্ষতিও বেশ কিছু হয়েছিল। সেদিনের সেই আগুন কি অলক্ষ্যে ভুবনমোহন ও গ্রেট ন্যাশনালের ভাগ্য পুড়িয়ে দিয়েছিল? সে-কথায় না গিয়ে এটুকু বলা যায় যে, ভুবনমোহনের পরে সোনার আশায় যারা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারকে আঁকড়ে ধরেছে তাদের মুঠো ধুলোয় ভরে গেছে। কেদারনাথ চৌধুরীও থিয়েটার লীজ নিয়ে সুবিধে করতে পারলেন না। অবশ্য তার কিছু কারণও ছিল। গিরিশচন্দ্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তাঁর অভিনয়ে অংশগ্রহণ অনিয়মিত হয়ে উঠেছিল। উপেন্দ্রনাথ আইন পড়তে বিলেত চলে গিয়েছিলেন। অমৃতলাল বসু চাকরি নিয়ে কিছুদিনের জন্তে নিজেকে থিয়ে-

টারের বাইরে রেখেছিলেন। এইসব কারণে গ্রেট ন্যাশনাল বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ব্যবসার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে কেদারনাথ চৌধুরী একবছরের জন্যে থিয়েটার সাব-লীজ দিলেন। বড়বাজারের কটন স্ট্রিটের অবাঙালি ব্যবসায়ী গোপীচাঁদ ও রূপচাঁদ শেঠির সঙ্গে তিনি একটি সাব-লীজ এগ্রিমেন্ট করলেন। শর্ত হলো, এক হাজার টাকা সেলামী ও মাসে একশো টাকা কেদারনাথকে দিতে হবে। এছাড়া থিয়েটার-বাড়ির জমির মালিক জমিদার মহেন্দ্রলাল দাসকে ভাড়া হিসাবে মাসে একশো পঁচিশ টাকা দিতে বাধ্য থাকবে শেঠিরা। নতুন ইজারাদার শেঠিরা অবিনাশ করকে ম্যানেজার নিযুক্ত করে থিয়েটার চালু করল। মঞ্চস্থ হলো প্রমোদ-কানন ও গীতিনাট্য কামিনীকুঞ্জ। কিছুদিন অভিনয় চালিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল কলকাতার বাইরে পূর্ববঙ্গে ঢাকা ও অন্যান্য জায়গায় নাটক পরিবেশন করতে বেরিয়ে গেল।

ভুবনমোহন নিয়োগীর ভাগ্যাকাশে আবার মেঘের ঘনঘটা। আবার মামলা। আবার আদালতের সমন এল। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এত লোকের কাছে তিনি টাকা নিয়েছেন, সবকিছু মনে রাখা দুঃসাধ্য। আর্জির নকল পড়ে তিনি দেখলেন, তিন বছর আগে কলেজ স্ট্রিটের ক্ষেত্রমোহন নাগের কাছে বার্ষিক শতকরা তিরিশ টাকা সুদে তিনি হাজার টাকা নিয়েছেন। কোর্টে হাজির হয়ে দু' হাজারেরও কিছু বেশি দিয়ে মামলাটা আপসে মিটিয়ে নিলেন।

কিছুদিন পরের কথা। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের দল বাইরে থেকে ঘুরে এসে কলকাতায় নাটক পরিবেশনের তোড়জোড় করছে। এমন সময়ে একদিন কোর্টের বেলিফ পুলিশ নিয়ে হাজির। বহুদিন ভাড়া না পেয়ে জমিদার মহেন্দ্রলাল দাস ছোটো আদালতে নালিশ করেছিলেন। সেই মামলায় মহেন্দ্র ডিক্রি পেয়েছেন। সে-খবর কেদারনাথ বা ভুবন নিয়োগী জানতেন না। আদালতের আদেশে থিয়েটারের সব সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র ক্রোক করা হলো। প্রকাশ্য নীলামে সবকিছু বিক্রি হয়ে গেল। শেঠিরা তখন গা ঢাকা দিয়েছে। কেদারনাথ চৌধুরী নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নিয়ে সে-দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখলেন। তিনি ভাবতেই পারেননি শেঠিরা থিয়েটার হাতে নেওয়ার পর জমিদারকে এক পয়সাও ভাড়া দেয়নি। কেদারনাথের চোখের সামনে থিয়েটারের যাবতীয় মাল গোপীচাঁদ শেঠির বেনামীতে অবিনাশ কর কিনে নিলেন। বাধা দেওয়ার কোনো ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাছাড়া গোপীচাঁদের সঙ্গে লীজের মেয়াদ তখনও শেষ হয়নি।

তাহলে উপায় ? মরিয়া হয়ে পরের দিন কেদারনাথ চৌধুরী গোপীচাঁদ ও রূপচাঁদের নামে হাইকোর্টে মামলা করলেন। নীলাম করা মালের দাম বাবদ দাবি করলেন পাঁচ হাজার ছ' শ' উনিশ টাকা এবং থিয়েটারের ভাড়া বাইশ শ' টাকা। শেঠিদের পক্ষে রূপচাঁদ আদালতে এসে অনেক নতুন গল্প শোনালেন। বললেন, এগ্রিমেণ্ট অনুযায়ী কেদারনাথ তাঁকে সাজ-সরঞ্জাম দেননি। তাছাড়া এগ্রিমেণ্টটা বাতিলযোগ্য। কারণ, চুক্তি সই করার সময়ে গোপীনাথ নাবালক ছিল। কেদারনাথ দরকারি আসবাবপত্র না-দেওয়ায় বাইরে থেকে তাঁদের অনেক কিছু কিনতে হয়েছে। সে-ব্যাপারেও তাঁদের অনেক টাকা লোকসান হয়েছে। রূপচাঁদের এইসব কথায় মামলা জটিল হয়ে উঠল। কেদারনাথ বুঝলেন ওদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের কোনো আশা নেই। মাত্র একহাজার টাকায় কেদারনাথ মামলাটা মিটিয়ে নিলেন। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির বোঝাটা চেপে গেল ভুবন নিয়োগীর মাথায়। ভুবনমোহন নতুন করে থিয়েটার লীজ দিলেন অবিনাশ করকে। গ্রেট ন্যাশনালের অবস্থা তখন যুদ্ধপরবর্তী বিধ্বস্ত শহরের চেহারা নিয়েছে। ভগ্ননীড়। চারিদিকে ছড়ানো ছিটানো ভাঙা আসবাব। চার দেওয়ালের মধ্যে বোবা কান্না। থমথম করছে রঙ্গমুখর রঙ্গশালা। নতুন করে থিয়েটার সাজিয়েও অবিনাশ কর চালাতে পারলেন না। তিনি পিছু হাঁটলেন। এগিয়ে এলেন কেদার চৌধুরীর মামা কালিদাস মিত্র। কিন্তু ভাঙা আসর জমাতে তিনিও ব্যর্থ হলেন। তাঁর পরে যোগেন মিত্তির ওরফে লঙ্কাবাবু থিয়েটার হাতে নিয়ে শেষ চেষ্টা করলেন। বিফল হয়ে তিনিও বিদায় নিলেন। থিয়েটার আবার ফিরে এল ভুবন নিয়োগীর হাতে। অচল থিয়েটার নিয়ে তখনও তিনি স্বপ্ন দেখছেন। কানে বাজছে ঘুঙুরের আওয়াজ আর কনসার্টের সমবেত ঐক্যতান। তখনও ভুবনমোহন জীবনপণ চেষ্টা করছেন থিয়েটারের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে৷

সে যুগের কলকাতার এক নামজাদা ধনী প্রতাপচাঁদ জহুরী। মণিমুক্তর বিরাট কারবার ছিল তাঁর। প্রতাপচাঁদ সত্যিই জহুরী ছিলেন। জহর চেনার ক্ষমতা রাখতেন তিনি। খবর রাখতেন কোন্ বড়োলোকের ছেলে আমোদ-প্রমোদে টাকা ওড়াচ্ছে। ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে কোন্ জমিদার কোষাগার শূন্য করে ফেলেছেন। খবর রাখতেন জলের দামে কে বাড়ি বেচে দিচ্ছে। সেকালের কলকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক প্রয়োজনে তাঁর কাছে হাজির হয়েছিলেন। এমনকি মহামান্য কালীপ্রসন্ন সিংহ, টিপু সুলতানের বংশধর প্রিন্স মহম্মদ ফারুক শা এবং

আরও অনেকে। ভুবনমোহন নিয়োগীও বাদ যাননি। তাঁর ধারের অঙ্ক ছিল চার হাজার। সুদ বার্ষিক শতকরা চব্বিশ টাকা। ভুবন নিয়োগী একদিন প্রতাপ-চাঁদের বড়তলা স্ট্রিটের গদিতে হাজির হলেন। বললেন, আমার কিছু রত্ন চাই। টাকাটা অবশ্য এখনই দিতে পারব না।

প্রতাপচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে টোপ গিললেন। ভুবনমোহন তাঁর অপরিচিত নন। অনেক বিষয়সম্পত্তির মালিক তিনি। ধার দিতে ক্ষতি কি? তাছাড়া একটা চালু থিয়েটার তো আছে। টাকা আদায়ের কোনো অসুবিধা হবে না। প্রতাপ বললেন, টাকার কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না বাবুসাহেব। এ-দোকান তো আপনারই। আপনার মতো লোক দয়া করে আমার গদিতে পা দিয়েছেন সেটা আমার পরম সৌভাগ্য।

প্রতাপচাঁদের আপ্যায়নে ভুবনমোহন গদগদ। তখন তামাম কলকাতায় কাপ্তেন হিসেবে তিনি সুপরিচিত। একরাশ অলঙ্কার ভুবনমোহনের সামনে মেলে ধরে প্রতাপ বললেন, কি চাই আপনার বেছে নিন। ভুবনমোহন তুলে নিলেন একটা বড়ো মরকত মণি-বসানো সোনার আঙটি, মণিমুক্তা-খচিত কয়েকজোড়া বালা এবং একটি নীলকান্ত মণি ও ষোল রতি অন্যান্য রত্ন—দাম চার হাজার টাকা। একটা হাতচিঠি লিখে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

এই ঘটনার তিন বছর পরের কথা। জল তখন অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। নানারকম বিপদে জড়িয়ে পড়েছেন ভুবনমোহন। প্রতাপচাঁদের টাকার এক পয়সাও তিনি শোধ করতে পারেননি। এই ক'টা বছরে তাঁর বেশিরভাগ সম্পত্তি দায়াবদ্ধ হয়েছে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও বাদ যায়নি। সেটা নিয়েও তিনি এক কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছেন। বাগবাজারের রামকান্ত বোস লেনের নবীনমণি দেবীর কাছে থিয়েটার বাঁধা রেখে বারো শ' টাকা ধার নিয়েছিলেন। তিন বছর অপেক্ষা করার পর নবীনমণি হাইকোর্টে নালিশ করে দিলেন। তাঁর অ্যাটর্নি ছিল খাস বিলিতি ফার্ম পিটার অ্যাণ্ড হুইলার। সময় আঠারো শ' ঊনআশি সাল। নোটিশ পেয়ে ভুবনমোহন আদালতে হাজির হলেন। সুদ আসল ও মামলার খরচ জুড়ে দু' হাজার টাকার দায় তিনি স্বীকার করে নিলেন। সতেরোই নভেম্বর বিচারপতি আর্থার উইলসনের কোর্টে ডিক্রি হয়ে গেল। ভুবনমোহন নবীনমণির প্রতিবেশি ছিলেন। ভুবনকে টাকা শোধ করার অনেক সময় দিলেন তিনি। শেষে বিরক্ত হয়ে ভাই-য়ের পরামর্শে গ্রেট ন্যাশনালকে আদালতের আদেশে নীলামে তুলে দিলেন। আঠারো শ' আশি সালের ছয় মার্চ নীলামের দিন ঠিক হলো।

গ্রেট ন্যাশনালের নীলামের খবর যখন প্রতাপ জহুরীর কানে পৌঁছাল তখন তিনি ভাবনায় পড়লেন। ভেতরে ভেতরে ভুবন নিয়োগী যে নিজেকে এতখানি জড়িয়ে ফেলেছেন প্রতাপ তা টের পাননি। তবে কি তাঁর টাকাটা জলে পড়ল? কোনো একটা উপায় বের করার জন্যে তিনি ছুটলেন নবীনমণির কাছে। অত্যন্ত বিনয়ী হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। নবীনমণি পর্দানশীন হিন্দু মহিলা। অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষের সামনে তিনি আসবেন না। পর্দার আড়াল থেকে লোক মারফৎ তিনি জানতে চাইলেন প্রতাপচাঁদ কি চান। সংক্ষেপে সব কিছু বলার পর প্রতাপ বললেন, বহিনজি, গ্রেট থিয়েটারের অনেক ঝামেলা। খদ্দের পাওয়া শক্ত। শেষ পর্যন্ত থিয়েটার আপনাকেই হয়তো নিতে হবে। কিন্তু দখল নিয়ে আপনি কি করবেন? ওসব নোংরা ব্যবসা। আপনি খানদানি ঘরের জেনানা। টাকার বদলে ইঁট কাঠ নিয়ে আপনার কিছুই লাভ হবে না। ডিক্রিটা বরং আমাকে বিক্রি করে দিন। আমি আপনার টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

নবীনমণির কাছে প্রস্তাবটা ভালোই লেগেছিল। সহজে যদি টাকাটা এসে যায় ভালোই তো। কিন্তু আদালতে তখন নীলামের দিন ঠিক হয়ে গেছে। ইচ্ছে থাকলেও কিছু করার উপায় নেই। নবীনমণি বললেন, থিয়েটারের ওপর তাঁর কোনো লোভ নেই। প্রতাপ যদি থিয়েটার কিনতে চান তাহলে নীলাম ডাকুন।

নির্দিষ্ট দিনে হাইকোর্টে হাজির হয়ে প্রতাপচাঁদ নীলামে দর হাঁকলেন। অভিশপ্ত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতি সেদিন খুব কম লোকই আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রতাপ জহুরী নীলামে সর্বোচ্চ ডাক দিয়ে মাত্র আড়াই হাজার টাকায় থিয়েটার কিনে নিলেন। নবীনমণি সহজেই তাঁর টাকা ফিরে পেলেন। ভুবনমোহন নিয়োগী নেপথ্যে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন জীবনের ভাঙাগড়ার খেলা। জীবনটাই নাটক। হয়তো নাটকের চেয়েও বড়ো।

প্রতাপচাঁদ জহুরী থিয়েটার কেনার পর দখল নিতে হিমশিম খেয়ে গেলেন। ভুবন নিয়োগীর দলের লোক তাঁকে কিছুতেই থিয়েটারে ঢুকতে দেবে না। তারা দল বেঁধে বসে রইল থিয়েটার-বাড়ির দরজায়। যে-নাট্যশালা তাদের অক্লান্ত চেষ্টায় জন্ম নিয়েছে তার অধিকার তারা সহজে ছেড়ে দেবে না। থিয়েটার দখল নেওয়ার জন্যে প্রতাপ কোর্টঘর করতে লাগলেন। দীর্ঘ পাঁচ মাস লড়াই করার পর কলকাতার শেরিফ আর পুলিশের সাহায্যে তিনি থিয়েটারে ঢুকলেন।

নানারকম বাধাবিপত্তির মধ্যে প্রতাপচাঁদের মালিকানায় গ্রেট ন্যাশনালের যাত্রা হলো শুরু। গিরিশ ঘোষ তখন সেখানে একাধারে ম্যানেজার, নাট্যকার ও

পরিচালক। গিরিশ ঘোষের পৌরাণিক নাটক রাবণবধ ও স্থরেন্দ্র মজুমদারের ঐতিহাসিক নাটক হামীর একযোগে চালু হলো। রাবণবধ পালায় রামের ভূমিকায় গিরিশ ঘোষ, রাবণ অমৃতলাল মিত্র, লক্ষ্মণ মহেন্দ্রলাল বস্থ, বিভীষণ অমৃতলাল বস্থ, স্থগ্রীব উপেন্দ্রনাথ দাস ও হনুমানের চরিত্রে অঘোরনাথ পাঠক রূপ দিতেন। সেই সময়টা ছিল নাট্যজগতের যুগ পরিবর্তনের ক্ষণ। প্রতাপ জহুরী ন্যাশনাল হাতে নেওয়ার দু' বছর আগে দেশে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বলবৎ হয়েছিল ' সরকার-বিরোধী সবরকম সাহিত্য নির্বাসিত হয়েছিল। কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ নাটকের যুগও তখন শেষ। দর্শকদের রুচি ক্রমশ বদলাচ্ছিল। সেই সময় থেকেই আমাদের ভাব-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মচেতনা একটা নতুন প্রেরণা নিয়ে জন-মনে উদয় হচ্ছিল। সেদিনের সেই যুগসন্ধিক্ষণে ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্মচেতনার মূলে ছিলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। গিরিশ ঘোষের মধ্যেও এসে পড়েছিল এই দুই মহাপুরুষের প্রভাব। গিরিশ মন দিলেন নাটক রচনায়। পৌরাণিক আর ধর্মমূলক নাটক। গিরিশ পর পর লিখলেন মায়াতরু, সীতার বনবাস, অভিমন্যুবধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, ধ্রুব চরিত্র ও নল দময়ন্তী। গিরিশ ঘোষের পরিচালনায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার তার পূর্বগৌরব ফিরে পেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা স্থায়ী হলো না। প্রতাপচাঁদ জহুরীর সঙ্গে গিরিশের বিরোধ বাধল। গিরিশ গ্রেট ন্যাশনাল ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন তিন অভিনেত্রী—বিনোদিনী কাদম্বিনী ও ক্ষেত্রমণি।

ঠিক সেই সময়ে বিনোদিনীর জীবনের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে যায়। একটি সম্ভ্রান্ত ধনী ছেলেকে সে ভালোবেসেছিল। ইচ্ছে ছিল অভিনয় ছেড়ে দিয়ে সুস্থ সংসারজীবনে ফিরে আসবে। একদিন সেই প্রেমাস্পদ অন্য মেয়েকে বিয়ে করে কলকাতার বাইরে চলে গেল। সে-আঘাত বিনোদিনীর কাছে ছিল মর্মান্তিক। জীবন দিয়ে যৌবন দিয়ে সেদিন সে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল ঘুণধরা সমাজের ওপর। জীবনের সেই চরম মুহূর্তে তার কাছে হাজির হয়েছিল তার রূপমুগ্ধ এক অবাঙালি ব্যবসায়ী। নাম গুর্মুখ রায়। তার চোখে ছিল বিনোদিনীর প্রতি প্রসন্ন প্রণয়তৃষ্ণা। নতুন একটা থিয়েটার গড়ার প্রতিশ্রুতির আবেদন রাখল সে বিনোদিনীর কাছে। সে-আবেদনে সাড়া দিল বিনোদিনী। সে কি শুধুই ভালবাসা না নতুন কোনো স্বপ্ন দেখা? যাই হোক, বিনোদিনী খুশি হয়েছিল।

গুর্মুখ রায়ের আনুকূল্য বিনোদিনীর স্বপ্নবাসর স্টার থিয়েটার স্থাপিত হলো বিডন স্ট্রিটে আঠারো শ' তিরাশি সালে। একুশে জুলাই তারিখে গিরিশ ঘোষের

দক্ষযজ্ঞ নাটক দিয়ে স্টারের যাত্রা হলো শুরু। প্রথম অভিনয় রাত্রেই দক্ষযজ্ঞ বিপুল জন-অভিনন্দন লাভ করল। বিনোদিনীর নিজের কথায়—'প্রথম দিনের সে লোকারণ্য, সেই খড়খড়ি দেয়ালে লোক সব ঝুলিয়া ঝুলিয়া বসিয়া থাকা দেখিয়া আমাদের বুকের ভিতর দুর দুর করিয়া কম্পন বর্ণনাতীতা। আমাদেরই সব দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। কিন্তু যখন অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন দেবতার বরে যেন সত্যই দক্ষালয়ের কার্য আরম্ভ হইল। বঙ্গের গ্যারিক গিরিশবাবুর তেজোপূর্ণ গুরুগম্ভীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি যখন স্টেজে উপস্থিত হইল তখন সকলেই চুপ।···গিরিশবাবুর দক্ষ, অমৃত মিত্রের মহাদেব যে একবার দেখিয়াছে সে বোধ হয় কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না।' নিজের অভিনয়ের কথা বিনোদিনী বলতে পারেনি। কিন্তু তাঁর সতী চরিত্রে অভিনয় ছিল অনবদ্য।

এই নাটকের সাফল্যের পর আরও দু'খানি নাটক উপহার দিলেন গিরিশ ঘোষ। ধ্রুব চরিত্র ও নল দময়ন্তী। অভিনয়-সূচিতে গিরিশ ঘোষ ছাড়াও ছিলেন অমৃতলাল মিত্র। অমৃতলাল বসু, নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, ভূষণ-কুমারী, কাদম্বিনী ও নটী বিনোদিনী। তারপর স্টার থিয়েটার গিরিশের লেখা প্রহ্লাদ চরিত্র নাটক নামাল। কিন্তু সে-নাটক তেমন জমেনি। তার কারণ, এর কিছুদিন আগে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের রেশ তখনও দর্শকদের কানে বাজছিল। কুসুমকুমারীর মন-মাতানো গান তখনও লোকের মুখে মুখে ফিরছিল।

গিরিশ ঘোষ তখন পর পর নাটক লিখে চলেছেন। জীবনের শুরু থেকে সাংসারিক বিপর্যয় ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে। স্ত্রী-বিয়োগ সন্তান-বিয়োগের বেদনা তিনি ভুলতে চেয়েছেন মঞ্চকে আশ্রয় করে। সে কি ভোলা যায়? তিনি তখন অশান্ত অস্থিরচিত্ত। মনোবেদনা প্রকট হয়ে উঠেছে। আত্ম-বিলাপের দহনে সর্বশরীরে জ্বালা। একমাত্র ছেলে সুরেন, পরবর্তীকালে যিনি দানীবাবু নামে খ্যাতিমান, তার তখন মাত্র ষোল বছর বয়স। গিরিশ নিজেকে মদের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চান। তারই মাঝে নাটক লেখা চলতে থাকে। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে নাটকের সংলাপ বলে যান। অনুলেখক অবিনাশ গাঙ্গুলী তাই শুনে লিখে চলেন। কমলে কামিনী, বৃষকেতু, শ্রীবৎস চিন্তা, চৈতন্য লীলা। কিন্তু শান্তি কোথায়? খ্যাতির বোঝা, টাকার প্রাচুর্য কিছুই তো শান্তি দিতে পারছে না! তার জন্যে চাই করুণাময়ের আশীর্বাদ। করুণার স্নিগ্ধ বারিধারা-

সিঞ্চনে যিনি তাঁর মনটাকে সুশীতল করে দেবেন। কে তিনি? কোথায় তিনি?

মনের এমনি টানাপোড়েনের মাঝে একদিন গিরিশ সাক্ষাৎ পেলেন সেই দিব্য-পুরুষের। তাঁর দিব্যচক্ষুর দিকে তাকিয়ে এমনভাবে সারা দেহ কেন শিহরিত হয়ে উঠল, বাক্‌শক্তি কেন হারিয়ে গেল! গিরিশের দু'টি চোখ অপলক, মনের মধ্যে তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের আলোড়ন; চুম্বকের মতো গিরিশকে আকর্ষণ করেছিলেন সেই দিব্যপুরুষ। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। গিরিশ অভিভূত। কিছুটা উদভ্রান্ত। সেই দিন গিরিশ ঘোষের নব রূপান্তর হলো। নবজন্মও বোধ হয়। তবুও মনে শান্তি নেই, তিনি যে পরম নাস্তিক। বিশ্বাস আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। বারবার যাচাই করতে ইচ্ছে হচ্ছে রামকৃষ্ণকে। মনটা উচাটন হলেই গিরিশ ছুটে যান দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের পায়ের কাছে গিয়ে বসে থাকেন।, শোনেন অভয় বাণী—মনটা শান্ত হয়। রামকৃষ্ণকে তিনি বলেন, প্রভু, তুমিই ঈশ্বর। মানুষের দেহধারণ করে তুমি এসেছ মানুষকে শিক্ষা দিতে। ঠাকুর সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে শুধু বলেন, মাকে ডাক, মাকে ডাক—গিরিশের চোখ ছাপিয়ে জল আসে। বলেন, মাকে তো ডাকছি। কিন্তু তুমি না হলে পতিত দুর্বল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে কে? ঠাকুর বলেন, আমি কেউ না, কিছু না রে। তুই মাকে ডাক।

গিরিশ থিয়েটারে ফিরে আসেন। প্রাণ দিয়ে অভিনয় করেন। তিনি তখন মদে উন্মাদ। ভক্তিরসেও টলমল। ভক্তিরসের ধারায় তিনি তখন শুচিস্নাত।

আঠারো শ' চুরাশির একুশে সেপ্টেম্বর। রামকৃষ্ণদেব প্রথম পা দিলেন স্টার থিয়েটারে। গিরিশের অনেকদিনের ইচ্ছে পূর্ণ হলো। ঠাকুরের থিয়েটারে যাওয়াটা কিছু কিছু ভক্ত ভালো চোখে দেখেনি। তারা বললে, থিয়েটারে নষ্ট মেয়েরা অভিনয় করে। আপনি কেন তা দেখতে যাবেন? ঠাকুর মৃদু হেসে বলেছিলেন, তাতে কি হয়েছে? আমি ওদের আনন্দময়ী রূপে দেখব। কোনো আপত্তিই তিনি মানলেন না। অভিনয় দেখে মহা খুশি। সাজঘর থেকে বেরিয়ে গিরিশ তাঁর পায়ের তলায় বসলেন। কিছু বলার আগেই ঠাকুর বললেন, তুমি খাসা লিখেছ। গিরিশ বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আমার ভক্তি নেই। ধারণা নেই। শুধু লিখেই গেছি। ঠাকুরের সস্নেহ জবাব, লিখে যাও, এমনি ভাবেই লিখে যাও। ওতে লোকশিক্ষা হবে।

গিরিশের জীবনের সেই রূপান্তরের শুভক্ষণে স্টার থিয়েটারের ভিত কেঁপে উঠল। গুর্মুখ রায়ের উৎসাহ ক্রমশ কমতে শুরু করল। গিরিশ দেখলেন, গুর্মুখ থিয়েটার চালাতে আসেনি, এসেছিল অন্য উদ্দেশ্যে। তার লক্ষ্য ছিল বিনোদিনী।

তাকে খুশি করার জন্যেই সে থিয়েটার খুলেছিল। সে ব্যবসা করতে আসেনি। এসেছিল মোহবশে। বিনোদিনীকে থিয়েটার ছাড়িয়ে নিজের রক্ষিতা হিসাবে পেতে চাইল সে। সে-প্রস্তাবে বিনোদিনী রাজি হয়নি। থিয়েটার তার স্বপ্ন। তার প্রাণাধিক প্রিয়। অভিনয়ের জগৎ থেকে সে কিছুতেই সরে আসতে পারবে না। সেখানেই বিনোদিনীর বিরোধ বাধল গুর্মুখ রায়ের সঙ্গে। ইতিমধ্যে গুর্মুখ রায় বেহিসেবী খরচ করে বেশ ক'টি মামলায় জড়িয়ে পড়ল। বেনেটোলার কাঠের ব্যবসায়ী গদাধর দাস হাইকোর্টে নালিশ করল। থিয়েটারের স্টেজ তৈরির ব্যাপারে চার হাজার টাকার সেগুন কাঠ সরবরাহ করেছিল সে। গদাধরের পক্ষে অ্যাটর্নি ছিলেন সি. এফ. ম্যানুয়েল। গুর্মুখের অ্যাটর্নি মিস্টার গ্রেগরী। টাকা দেওয়া দূরে থাক, কোর্টে হাজির হয়ে গুর্মুখ গদাধরের দাবি অস্বীকার করে রুখে দাঁড়াল। সে বললে, গদাধর নীচুমানের কাঠ সরবরাহ করেছে এবং হিসাবে গরমিল আছে। কিন্তু আদালতে সেসব আপত্তি টেঁকেনি। কড়ায় গণ্ডায় টাকা শোধ করতে হয়েছিল গুর্মুখ রায়কে। থিয়েটারের আকাশে ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব হয়েছিল গুর্মুখ রায়ের। তারপর আকস্মিকভাবে তার অস্তিত্ব মুছে গেল। স্টার থিয়েটার বিক্রি হয়ে গেল। কিনে নিলেন অমৃতলাল মিত্র, হরিপ্রসাদ বসু ও দাসুচরণ নিয়োগী। আর্থিক সহায়তার জন্যে ওদের পেছনে ছিলেন জোড়া-সাঁকোর ধনী কৃষ্ণধন দত্ত।

ভুবন নিয়োগীর সৌভাগ্যের সূর্য তখন অস্তমিত। মানসিক যন্ত্রনায় তিনি ছটফট করছেন। হারানোর বেদনা এক জিনিস। পেয়ে হারানোর বেদনা তার চেয়ে অনেক বড়ো। সত্যিই সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। নিয়োগী পরিবারের বিষয়সম্পত্তি আর ধনদৌলত রূপকথার গল্প বলেই মনে হয়। অবিবেচনায় আর অমিতব্যয়িতায় ভুবন তা আতসবাজির মতো পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছেন। রিক্ত মানুষটার পাশে দাঁড়াবার জন্যে তখন আর কেউ নেই। বন্ধু আর মোসাহেবদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই দুঃসময়ের মাঝে আঠারো শ' চুরাশি সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভুবনের মা রাখালমণি মারা গেলেন। ভুবনকে নিয়ে অনেক মনোবেদনায় ভুগেছিলেন তিনি। আগেই বলেছি, অশান্তির জ্বালায় মনের দুঃখে তিনি স্বামীর ভিটে ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর অবাধ্য সন্তানকে ক্ষমা করেছিলেন কিনা কে জানে!

আঠারো শ' চুরাশি ভুবনমোহন নিয়োগীর কাল বৎসর। সেই বছরেই ছোটো

ভাই হরিদাস নিয়োগী তাঁর নামে হাইকোর্টে মামলা করলেন। পরামর্শটা হরিদাসের শ্বশুরের। পারিবারিক সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সময় থাকতে যদি সবকিছু বুঝে নেওয়া না যায় তাহলে ভবিষ্যতে কিছুই থাকবে না। ভুবনমোহনের বড়ো বৌদি তখন সাবালিকা হয়েছেন। স্বামী মারা যাওয়ার সময়ে তাঁর গর্ভে যে সন্তান ছিল সে পৃথিবীর আলো দেখতে পায়নি। বিধবা হওয়ার পর অন্নপূর্ণা হাটখোলায় তাঁর বাপের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর ন্যায্য পাওনা তখনও মেটেনি। তিনিও একটা মামলা জুড়ে দিলেন। তাছাড়া রাখালমণির ভাগের সম্পত্তির একটা বিলিব্যবস্থা দরকার। এক সঙ্গে দুটো মামলা চলতে থাকায় ভুবনমোহন নাজেহাল হয়ে পড়লেন। কিন্তু উপায় নেই। আইন তাঁকে ক্ষমা করবে না। মানুষ তার নিজের পাওনা বুঝে নেবে। সেখানে আপস নেই ভালবাসা নেই আত্মীয়তা নেই।

বাগবাজারের নিয়োগী পরিবার এক অভিশপ্ত পরিবার। মামলা চলতে চলতে হরিদাস হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর স্ত্রী সরলা তখনও নাবালিকা। সরলার বাবা কাশীনাথ বিশ্বাস আগ্রায় ছোটো আদালতের জজ ছিলেন। জামাই মারা যাওয়ার দুঃসংবাদ শুনে তিনি ছুটে এলেন কলকাতায়। মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো ভাষা নেই। এই নিদারুণ শোক তিনি নিজেই-বা সামলাবেন কেমন করে? তবুও মানুষকে উঠে দাঁড়াতে হয়। মেয়ের মুখ চেয়ে কাশীনাথও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। শক্ত হাতে তিনি মামলা লড়েছিলেন। সরলার অংশের ষোল আনা তিনি বুঝে পেয়েছিলেন আদালতের কাছ থেকে। অন্নপূর্ণাও বঞ্চিত হননি। এই মামলার চূড়ান্ত সুবিচার করেছিলেন বিচারপতি জন ফ্রিম্যান নরিস।

চুরাশিতে ভুবনমোহনের নামে আরও একটা বড়ো মামলা রুজু হয়েছিল। নালিশ করেছিলেন প্রতাপচাঁদ জহুরী। আগেই বলা হয়েছে কয়েক বছর আগে মাত্র আড়াই হাজার টাকায় হাইকোর্টের নীলামে তিনি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কিনেছিলেন। কিন্তু চালাতে পারেননি। থিয়েটারের নেশা মিটে গেলেও টাকার নেশায় তিনি মাতাল। ভুবন নিয়োগীর সই করা একটা দলিল প্রতাপ আদালতে পেশ করলেন। পাঁচ বছর আগে ভুবন তাঁর কাছে চার হাজার টাকার রত্ন কিনে একটা বন্ধকী দলিল সই করেছিলেন। সুদ এবং আসল মিলিয়ে পাওনা হয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজার। আদালতের সমন পেয়ে ভুবনমোহন অবাক। গত পাঁচ বছরে কত টাকাই তো তিনি প্রতাপকে দিয়েছেন। প্রতাপ কোনো রসিদ দেননি। সরল বিশ্বাসে ভুবন টাকা দিয়েছেন কিন্তু কাগজে-কলমে কোনো উসুল লেখা হয়নি।

আজ তাঁর সেই ভুল আর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতাপ লোভের হাত বাড়িয়েছেন। কিন্তু সে-কথা ভেবে আর লাভ নেই। কোর্টে হাজির হয়ে ভুবনমোহন বললেন, কয়েক বছর আগে তিনি চার হাজার টাকার একটা দলিলে সই করেছেন সত্যি। প্রতাপচাঁদ তাঁকে টাকা নগদে দেননি। ভুবন নিয়োগী তাঁর কাছ থেকে চার হাজার টাকার মণিমুক্তো কিনেছিলেন। রত্ন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকায় তিনি সেগুলোর বাজার দর জানতেন না। পরে যাচাই করে দেখেছেন তার দাম হাজার টাকার বেশি নয়। সুযোগ পেয়ে প্রতাপচাঁদ তার ওপর অত্যন্ত চড়া সুদের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আদালতের নীলামে থিয়েটার কেনাটা প্রতাপচাঁদের একটা অপকৌশল। থিয়েটার চালাতে না পেরে প্রতাপ এই মামলার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর পাওনা টাকা অনেকদিন আগেই শোধ হয়ে গেছে।

ভুবনমোহনের এসব কথা আদালত গ্রাহ্য করেনি। সাক্ষী সাবুদ সওয়াল জবাব সবই হয়েছিল। ভুবনমোহনের অ্যাটর্নি ছিলেন নন্দগোপাল নিয়োগী। প্রতাপচাঁদের ই. জে. ফিঙ্ক। সাক্ষ্য দিতে উঠে ভুবনমোহন স্নায়ুর দুর্বলতায় কাঁপছিলেন। প্রতাপচাঁদের মুখোমুখি হয়ে এতদিন কেন তিনি কোনো বোঝাপড়া করেননি? কি কারণ? সম্মান আভিজাত্য, না, বংশকৌলিন্য? বোধহয় তাই। শ্রেষ্ঠীর কাছে সম্রাট নত হননি। মর্যাদার লড়াইয়ে এমনি করেই ভুবন সবকিছু হারিয়েছেন। যদিও ভুবনমোহন আদালতকে বলেছিলেন পনেরো হাজার টাকার থিয়েটার আড়াই হাজার টাকায় কিনে প্রতাপ প্রচুর লাভ করেছেন, ধারের টাকা শোধ নিয়ে তিনি কাগজ ফেরত দেননি, তথাপি প্রমাণ ছাড়া এসব কথার কোনো দাম নেই। আঠারো শ' চুরাশি সালের ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে মামলার যবনিকা পতন হলো। ভুবনমোহনকে দিতে হবে সাকুল্যে সাড়ে সাত হাজার টাকা। এ-ছাড়া মামলায় প্রতাপচাঁদের যা খরচ হয়েছে। এই মামলায় ভুবনমোহন যা হারালেন তা তাঁর যক্ষের ধন, তাঁর স্বপ্ন ও সৃষ্টি। তাঁর সেদিনের সে-বেদনা বর্ণনার অতীত। আদালত থেকে ডিক্রি পেয়ে টাকার জন্যে দু' বছর অপেক্ষা করলেন প্রতাপ। তারপর প্রতাপচাঁদ টাকা আদায়ের জন্যে সচেষ্ট হলেন। এই মামলায় থিয়েটারের ওপর রিসিভার বসেছিলেন জে. সি. ম্যাকগ্রেগর। প্রতাপচাঁদের ব্যারিস্টার ডব্লিউ ব্যারো থিয়েটার নীলামের জন্যে আদালতে দরখাস্ত দিলেন। আদেশ হলো—কলকাতার শেরিফ নীলাম করবে। অবশ্য ভুবনমোহনেরও নীলাম ডাকার অধিকার থাকবে। আগের দু'জন পাওনাদার ক্ষেত্রমোহন নাগ ও এডওয়ার্ড রিজেস তাঁদের পুরো টাকা আদায় করতে পারেননি। আদেশ হলো থিয়েটার

বিক্রির টাকা থেকে আনুপাতিক হারে তাঁদের দেনাও শোধ করা হবে। নীলামের টালবাহানা করতে করতে একটা বছর কেটে গেল। আঠারো শ' সাতাশি সালের তেসরা মার্চ গ্রেট ন্যাশনাল আবার নীলামে উঠল। থিয়েটার কিনে নিলেন অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, হরিপ্রসাদ বসু ও দাসুচরণ নিয়োগী। বিক্রি হলো মাত্র ঊনত্রিশ শ' টাকায়। সরঞ্জামের মধ্যে ছিল কাঠের বাড়িটা, ফার্নিচার, সিনারি, গ্যাসপাইপ, বেঞ্চি ও কয়েকটা হারমোনিয়াম-সহ কিছু বাদ্যযন্ত্র।

থিয়েটারের দুনিয়া থেকে চিরকালের জন্যে বিদায় নিলেন ভুবনমোহন নিয়োগী। তারপর দীর্ঘদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। সে-জীবন তাঁর সুখেরও ছিল না স্বস্তিরও ছিল না। কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা অবশ্যই হয়েছিল। তাঁর পয়সা ওড়ানোর ব্যাপারটা সে-যুগে ছিল একটা সংবাদ। দুঃখের দুঃসহ গুরুভার নিয়ে অনেককাল বেঁচেছিলেন ভুবন নিয়োগী। আরও বহু মামলায় তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। বলরাম মজুমদার স্ট্রিটের বৃন্দারানী দাসী একটা মর্টগেজ মামলায় দাবি করেছিলেন একত্রিশ হাজার টাকা। নদীয়া ও চব্বিশ পরগনার জমিজমা তাঁর কাছে বাঁধা ছিল। আঠারো শ' নব্বই সালের মাঝামাঝি সেসব সম্পত্তি নীলাম হয়ে গেল। জলের দামে মাত্র দশ হাজার টাকায় বলতে গেলে একটা জমিদারি কিনে নিলেন মন্মথ ও প্রমথনাথ বিশ্বাস নামে দুই ক্রেতা। ধ্বংসের এই খেলা দাঁড়িয়ে দেখলেন ভুবনমোহন। পরিণত বয়সে উনিশ শ' সাতাশ সালে ভুবন মারা যান। একটি বিখ্যাত কবিতার লাইন: He died unhonoured, unwept and unsung—কথাটা ভুবনমোহন সম্পর্কে যথার্থই প্রযোজ্য। সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম স্রষ্টা নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন। ভাবীকালের মানুষের জন্যে রেখে গেলেন একটা ছোট্ট ইতিহাস। যশের ও অপযশের। সৃষ্টি ও ধ্বংসের এক হাসিকান্নার নাটক।

ফিরে আসি সেকালের স্টার থিয়েটারের কথায়। গুর্মুখ রায়ের হাত থেকে থিয়েটার কিনে নিয়ে অমৃতলাল মিত্রের দল বেশিদিন তা চালাতে পারেননি। তাঁরা সেখানে যেসব নাটক করেছিলেন তার মধ্যে কমলে কামিনী ও শ্রীবৎস চিন্তা ভালো ব্যবসা করেছিল। তারপর ঝিমিয়ে পড়ল। বিডন স্ট্রিটের স্টারের জমির মালিক ছিলেন কলুটোলার খ্যাতনামা ধনী গোপাললাল শীল। তাঁর মাথায় থিয়েটার খোলার নেশা চাপল। তিনি নিজে থিয়েটার চালাতে চাইলেন। টাকার জোরে তিনি স্টার থিয়েটার কিনে নিলেন। নগদ গুনে দিলেন তিরিশ হাজার

টাকা। এই বেচাকেনার ব্যাপারে অমৃতলাল মিত্রের সঙ্গে তাঁর শর্ত হলো স্টার নাম দিয়ে তিনি থিয়েটার চালাতে পারবেন না। গুডউইল পূর্বতন মালিকদেরই থাকবে। গোপাললাল তাতে রাজি হলেন। থিয়েটারের নাম দিলেন এমারেল্ড। আঠারো শ' সাতাশি সালের আট অক্টোবর তারিখে এমারেল্ড খোলা হলো। সে-সময়ে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, মহেন্দ্রলাল বসু, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, ছোটরানী, ভানুমতী প্রভৃতি। এইসব শক্তিমান নট থাকা সত্ত্বেও থিয়েটার জমাতে পারা গেল না। গোপাললাল ভাবলেন, গিরিশ ঘোষকে না আনতে পারলে থিয়েটার চলবে না। গিরিশের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করলেন। সুযোগ বুঝে গিরিশ ঘোষ কুড়ি হাজার টাকা বোনাস চেয়ে বসলেন। মাইনে চাইলেন মাসে সাড়ে তিন শ' টাকা। গোপাললালের কুবেরের ধন। এক-কথায় তিনি রাজি হয়ে গেলেন। এমারেল্ডে যোগ দিয়ে গিরিশ নাটক লিখলেন পূর্ণচন্দ্র ও বিষাদ। এই সময়ে গিরিশের দ্বিতীয়া স্ত্রী ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন। শোকে-দুঃখে ভেঙে পড়লেন গিরিশ। নিঃসঙ্গতা কাটাতে সুরার মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি। নিয়মিত থিয়েটারে আসা বন্ধ হলো তাঁর। অন্যান্য কিছু শিল্পীও অসহযোগ করছিলেন। তখন অভিনেত্রী বনবিহারিণীর সঙ্গে গোপাললালের একটা মামলা চলছে। দু' বছরের মাথায় গোপাললাল পিছু হাঁটতে শুরু করলেন। মতিলাল সুরকে তিনি থিয়েটার ভাড়া দিয়ে দিলেন।

ওদিকে অমৃতলাল মিত্র ও তাঁর সঙ্গীরা বেশ কিছুদিন ধরেই থিয়েটার খোলার তোড়জোড় করছিলেন। ব্যবস্থাও পাকা হয়ে গেল। আঠারো শ' অষ্টআশি সালের পঁচিশে মে তারিখে হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার নবজন্ম নিল। সে-নাম আজও অক্ষয় অম্লান। শতবর্ষের গতিচক্রে তার রূপ বদলেছে, রঙ বদলেছে, একের পর এক মালিক বদলেছে। হাজার হাজার নটনটী আর লক্ষ লক্ষ দর্শকের পদধূলি-স্পর্শধন্য সেই থিয়েটার আজও দাঁড়িয়ে আছে আনন্দ বিনোদনের উচ্চশির স্তম্ভ-রূপে। আজও থেকে গেছে সেই নাম। শতাধিক বছরের পুরানো নাম। স্টার। এটা কম গৌরবের কথা নয়। যুগে যুগে অতীত বুঝি এমনি করেই তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে চলমান বর্তমানের দিকে।

হাতিবাগানের স্টার থিয়েটার চালু হওয়ার পর এমারেল্ড ঝিমিয়ে পড়ল। গিরিশ ঘোষ স্টারে চলে এলেন। চুক্তি হলো স্টারের জন্য তিনি পাঁচখানি নাটক লিখবেন। পারিশ্রমিক পেলেন ছ' হাজারের কিছু বেশি। নামকরা অভিনেতা

অভিনেত্রী নিয়ে স্টার জমজমাট। পরপর বিভিন্ন নাটকের অভিনয় চলতে থাকে — নসীরাম, তরুলতা, সরলা, তাজ্জব ব্যাপার।

এমনিভাবে দু'টো বছর কেটে গেল। আঠারো শ' নব্বই সাল। গিরিশ-তনয় সুরেন তখন মাত্র বাইশ বছরের যুবক। সুকণ্ঠের অধিকারী। জন্মসূত্রে লাভ করেছেন অসাধারণ অভিনয়-ক্ষমতা। এখানে-সেখানে শখের দলে অভিনয় করে বেড়াচ্ছেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে আসার ইচ্ছে তাঁর। কিন্তু বাবার অমত। সুরেন ধরনা দিলেন অমৃতলাল বসুর কাছে। গিরিশের আপত্তি জেনেও অমৃতলাল একদিন সুরেন ওরফে দানীকে নিয়ে এলেন স্টার থিয়েটারে। প্রেক্ষাগৃহে পিতা-পুত্রের প্রথম সাক্ষাৎ। গিরিশ রাগে অগ্নিশর্মা। অমৃতলালের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হলেন। রঘুবীর নাটকে সুরেনের প্রথম মঞ্চাবতরণ। প্রথম অভিনয়ের রাত্রেই তিনি পেয়েছিলেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন। জনচিত্তজয়ী নট হিসেবে তাঁর আসন পাকা হয়ে গিয়েছিল।

গিরিশ ঘোষ কোনো মঞ্চেই স্থায়ীভাবে বেশিদিন থাকেননি। মতান্তরে আর মনান্তরে এক মঞ্চ থেকে অন্য মঞ্চে চলে যাওয়া ছিল তাঁর জীবনের নিয়মিত ঘটনা। বনিবনা না হওয়ায় স্টার থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি চলে এলেন। সেটা আঠারো শ' একানব্বই সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। তাঁর সঙ্গে নীলমাধব চক্রবর্তীও কাজে ইস্তফা দিলেন। আরও প্রায় পনেরোজন নটনটী তাঁদের অনুসরণ করলেন। গিরিশ আর নীলমাধব দুজনে মিলে একটা দল গড়লেন। পুরোদমে রিহার্সাল চলতে লাগল। পেশাদার ভ্রাম্যমান নাট্যসংস্থা হিসাবে তাঁরা বায়না নিতে শুরু করলেন। চোরবাগানে কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে বিল্বমঙ্গল ও বিবাহ বিভ্রাট নাটকের অভিনয় করলেন। তারপর রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে বরদাচরণ মিত্রের বাড়িতে বিল্বমঙ্গল ও তাজ্জব ব্যাপার পরিবেশন করলেন। আরও অনেক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি থেকে তাঁদের ডাক আসতে লাগল। আমন্ত্রণ এল বাগবাজারের জমিদার নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসুর বাড়ি থেকে। গিরিশ ঘোষ সানন্দে রাজি হয়ে বিল্বমঙ্গল, মলিনা-বিকাশ, বুদ্ধদেব চরিত ও তাজ্জব ব্যাপার অভিনয় করলেন। সারা কলকাতা তোলপাড়। গিরিশ ঘোষকে বাড়িতে এনে অভিনয় দেখার জন্যে কলকাতার অভিজাত মহলে রেষারেষি শুরু হলো। ডাকের পর ডাক। সাধারণ রঙ্গালয়ে দর্শক কমে গেল। এইসব

ব্যাপার দেখে স্টার থিয়েটার ভাবনায় পড়ল। গিরিশ ঘোষকে টাকা দিয়ে স্টার যেসব নাটক লিখিয়েছে, কোন্ অধিকারে তাদের বিনা অনুমতিতে গিরিশ সেসব নাটক অন্যত্র অভিনয় করেন? থিয়েটার কর্তৃপক্ষ আইনের পরামর্শ নিতে ছুটলেন অ্যাটর্নি গণেশচন্দ্র চন্দ্রর কাছে। তিনি গিরিশ ঘোষকে নোটিশ দিলেন অবিলম্বে নাটক অভিনয় বন্ধ করতে। নোটিশে বললেন, সবগুলো নাটকের মঞ্চ-অধিকার একমাত্র স্টারের।

গিরিশ ঘোষ ভয় পাওয়ার পাত্র ছিলেন না। বন্ধু প্রিয়নাথ বসু অ্যাটর্নির কাছে কাগজপত্র নিয়ে তিনি হাজির হলেন। প্রিয়নাথ সব দেখেশুনে বললেন স্টার থিয়েটার নাটক লেখার জন্যে টাকা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু চুক্তিপত্রে এমন কথা লেখা নেই যে সে-নাটক অন্যত্র অভিনীত হবে না। অবশ্য একটা শর্ত আছে যে অন্য কেউ সে-নাটক অভিনয় করতে গেলে আপনার অনুমতির দরকার। কিন্তু এখানে দেখছি আপনিই অভিনয়ের উদ্যোক্তা এবং দলের মালিক আপনি। নোটিশ গ্রাহ্য না করে আপনি অভিনয় চালিয়ে যান।

প্রিয়নাথের কথামতো গিরিশ ঘোষ অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগলেন। কয়েক দিন পরে স্টার থিয়েটার তাঁর নামে হাইকোর্টে নালিশ ঠুকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আদালত থেকে স্থগিতাদেশ আদায় করল অভিনয় বন্ধের জন্যে। সেখানেই স্টার চুপ করে বসে রইল না। নীলমাধব চক্রবর্তী ও প্রবোধ ঘোষের বিরুদ্ধে তারা আলাদা একটা মামলা করল। অভিযোগ এই যে, স্টারের মঞ্চে অভিনীত সরলা নাটক ওরা অন্যত্র অভিনয় করে বেড়াচ্ছেন। আদালতের আদেশে অভিনয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গিরিশ ঘোষ খুবই অপদস্থ হলেন। অনেকের কাছ থেকে তিনি বায়নার টাকা নিয়েছেন। যাই হোক, দুটো মামলারই শুনানী একসঙ্গে চলতে লাগল। জানা গেল, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা উপন্যাস অবলম্বনে সরলা নাটক তৈরি হয়েছে। অমৃতলাল বসু ও নীলমাধব চক্রবর্তী দুজনে মিলে এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। এতে কারোরই কোনো ব্যক্তিগত অধিকার নেই। তাছাড়া স্টার থিয়েটার সরলা নাটক অভিনয়ের জন্যে মূল লেখকের কোনো অনুমতি নেয়নি। আদালতে দু'পক্ষেরই বাদানুবাদ চলল। আদালত নাট্যামোদীদের ভিড়ে ভরে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি আর্থার উইলসন রায় দিলেন গিরিশ ঘোষের লেখা নাটক এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা উপন্যাসের ওপর স্টার থিয়েটারের একচেটিয়া অধিকার নেই। আঠারো শ' একানব্বই সালের এগারো আগস্ট মামলা দু'টি খারিজ হয়ে গেল। স্টার থিয়েটার হেরে গেল গিরিশ ঘোষের কাছে।

মামলায় জয়লাভের পর নীলমাধব চক্রবর্তী গিরিশ ঘোষকে ছেড়ে মেছুয়বাজারে বীণা মঞ্চ ভাড়া নিয়ে চালু করেন সিটি থিয়েটার। পরবর্তীকালের প্রখ্যাত অভিনেত্রী তিনকড়ি এই সিটি থিয়েটার থেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য বীণা মঞ্চে মীরাবাঈ নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করে ইতিপূর্বেই সে সুনাম অর্জন করেছিল। এখানে তিনকড়ির কথা কিছু বলা যাক। উত্তর কলকাতার নিন্দিত পল্লী চন্দ্রমোহন সুর লেনে একতলার একখানি ভাড়া করা ঘরে থাকত সে। সংসারে মা আতরমণি ছাড়া আর কেউ ছিল না। আতরমণি ছিল বারবিলাসিনী। সে চেয়েছিল তিনকড়ি তারই পেশা অবলম্বন করুক এবং কোনো ধনীর ভোগ-বিলাসে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে টাকা আয় করুক। কিন্তু তিনকড়ি সে-জীবন গ্রহণ করেনি। তার চোখে ছিল অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন। মার প্ররোচনায় নিজেকে বহুভোগ্যা করে তোলায় তার মন সায় দেয়নি। অভিনয় জীবনকেই সে বেছে নিয়েছিল। অভিনয়ই ছিল তার জীবন। জীবনটাই অভিনয়। কালে তিনকড়ি হয়ে উঠেছিল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের এক সফল অভিনেত্রী। আখ্যা পেয়েছিল মঞ্চের রানী।

বীণা থিয়েটারের কথায় আবার আসছি। নীলমাধব চক্রবর্তী হাতে নেওয়ার আগে ওর মালিক ছিলেন রাজকৃষ্ণ রায়। এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে কবি নাট্যকার অভিনেতা ও বাদ্যযন্ত্রী। তিনি একাধিক সাময়িকপত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন যার মধ্যে বীণা মাসিকপত্র সেকালে জনসমাদর পেয়েছিল। অভিনেতা হিসাবে তিনি নিজেকে প্রথম যুক্ত করেছিলেন আর্য নাট্য সমাজের সঙ্গে। সেই দলের প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকে হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি খ্যাতি পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজে থিয়েটার খুলেই তিনি সর্বনাশ ডেকে আনলেন। আঠারো শ' সাতাশি সালের ডিসেম্বরে থিয়েটার খুলে তিনি চন্দ্রহাস ও প্রহ্লাদ চরিত্র উপহার দিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া আদর্শবাদী। বারাঙ্গনা দিয়ে স্ত্রী ভূমিকার রূপারোপ তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। সেই কারণে থিয়েটার চালাতে পারলেন না এবং সর্বস্ব খোয়ালেন। অনেক পরে নিজের আদর্শ থেকে সরে এসে অভিনেত্রী এনে তিনি মীরাবাঈ গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করলেন কিন্তু থিয়েটার চালাতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেন। তখন তিনি দেনায় আকণ্ঠ ডুবে গেছেন।

আসলে রাজকৃষ্ণর ভাগ্য ছিল প্রতিকূল। শত চেষ্টাতেও তিনি দাঁড়াতে পারলেন না। মামলা মোকর্দ্দমায় তিনি নিঃস্ব হয়ে গেলেন। বীণা যন্ত্র নামে

তাঁর নিজের একটি ছাপাখানা ছিল। সেটিও দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেল। তাঁর মতো একজন গুণীলোকের অসহায় অবস্থা ও চরম দারিদ্র ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হলো সাধারণের কাছে। সেকালের অনুসন্ধান পত্রিকার অংশবিশেষ : আজ তিনি সাধারণের কৃপাপ্রার্থী। এখন সকলেই যাহার যেমন সাধ্য, রাজকৃষ্ণবাবুকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন, সাধারণের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ।

ভাগ্যবিপর্যয়ের সেই কঠিন-কঠোর দিনে রাজকৃষ্ণ রায়কে স্টার থিয়েটার ডেকে নিয়েছিল। তখন তাঁর সাধের বীণা থিয়েটার প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। রঙ্গালয়ের নাম ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস। সেখানে চলছিল জমজমাটি কনসার্ট আর বাঈজি নাচ। সময়টা আঠারো শ' বিরানব্বই সাল। তার দু' বছর পরে রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনাবসান ঘটে।

সেকালে থিয়েটারের জগতে ধূমকেতুর মতো এসেছিলেন আরও একজন। তাঁর নাম নগেন্দ্রভূষণ মুখার্জি। পাথুরেঘাটার ধনীপ্রবর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাতি। আঠারো শ' তিরানব্বই সালের কথা। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ফাঁকা জমিটা তখনও পড়ে ছিল। জমির মালিক মহেন্দ্রলাল দাসের কাছে নগেন্দ্র সেটা দশ বছরের জন্যে লীজ নিলেন। লীজের শর্ত অনুযায়ী, ইচ্ছে হলে আরও পাঁচ বছর মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। ছ' নম্বর বিডন স্ট্রিটের সেই জমিতে জন্ম নিল মিনার্ভা থিয়েটার। নগেন্দ্রভূষণের সহযোগী ছিলেন বন্ধু প্রমথনাথ দাস। থাকতেন গ্রে স্ট্রিটে।

এখানে নগেন্দ্রভূষণের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। তাঁর জীবনটা নাটকের চেয়ে কিছু কম নয়। দাদামশাই প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর একমাত্র ছেলে ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। প্রসন্ন-কুমারের তিন মেয়ে। হেমসুন্দরী, সুরসুন্দরী ও শ্রীসুন্দরী। মেজ মেয়ে সুরসুন্দরী প্রথম সন্তানপ্রসবের মাত্র সাতদিন পরে মারা যায়। সেই সন্তানই নগেন্দ্রভূষণ। সুরসুন্দরীর স্বামীর নাম ছিল শ্রীনাথ মুখার্জি। সদ্যোজাত নাতির কথা ভেবে শ্রীনাথকে বেঁধে রাখতে চাইলেন প্রসন্নকুমার। ছোটো মেয়ে শ্রীসুন্দরীর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। কিন্তু বিধাতা বিরূপ। মাত্র তিন বছর পরে শ্রীনাথ মারা গেল। শ্রীসুন্দরীর নিজের কোনো সন্তান হয়নি। নগেন্দ্রর মুখ চেয়ে সে শোক ভোলার চেষ্টা করেছিল। এই ঘটনার পর প্রসন্নকুমার প্রায় তিরিশ বছর পরে মারা যাবার সময় অগুনতি টাকা রেখে গিয়েছিলেন শ্রীসুন্দরীর জন্যে।

নগেন্দ্রভূষণের বয়স তখন চল্লিশ পেরিয়েছে। সেই সময়ে টাকাপয়সা নিয়ে তাঁর বিরোধ বাধল শ্রীসুন্দরীর সঙ্গে—যিনি তাঁর সৎ মা এবং তাঁর জন্মের সাতদিন পর থেকে তাঁকে মানুষ করেছেন। নগেন্দ্রর অ্যাটর্নি ছিলেন সেন কোম্পানির কামিনী গুহ এবং শ্রীসুন্দরীর পক্ষে রেমফ্রি সাহেব। পরের বছর শ্রীসুন্দরী নগেন্দ্রর নামে একটা পাণ্টা মামলা করে বললেন যে, গত ছ' বছর তিনি কাশীতে প্রবাসজীবন যাপন করছেন। নগেন্দ্র দীর্ঘদিন বিষয়সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের কোনো হিসেব তাকে দেননি। নগেন্দ্রকে দশ নম্বর প্রসন্নকুমার স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে তিনি আদালতের কাছে আবেদন করলেন। মামলা বেশ দানা বেঁধে উঠল। নগেন্দ্র সব অভিযোগ অস্বীকার করে বললেন, তাঁকে উচ্ছেদ করার কোনো অধিকার শ্রীসুন্দরীর নেই।

মামলা কয়েকদিন চলার পর শ্রীসুন্দরীর মনের পরিবর্তন হলো। এ তিনি কি করছেন? যে ছেলের জন্মের সাতদিন পর থেকে আপন পুত্রস্নেহে মানুষ করেছেন, যাকে বুকে করে তিনি প্রয়াত স্বামীর শোক ভুলেছেন, তাকে তিনি গৃহচ্যুত করতে চলেছেন? তাঁর সারা জীবনটাই তো কান্নায় ভরা। সে কান্না জমিয়ে রাখলে একটা নদীর রূপ নিত। জীবনের সায়াহ্নবেলায় ছেলের ওপর অভিমান করে এ তিনি কি করতে চলেছেন? নাই-বা হলেন জন্মদাত্রী। তিনি তো পালকমাতা। সে তো তাঁকেই মা বলে চিনেছে, মা বলে ডেকেছে। বাকি জীবনটা না-হয় তিনি কাটিয়ে দেবেন বাবা বিশ্বনাথের চরণতলে। একদিন আদালতে হাজির হয়ে ছেলের বিরুদ্ধে সব নালিশ তিনি তুলে নিলেন। সব কিছু ছেলেকে দিয়ে দিলেন। বিষয়সম্পত্তি সব ছেলেকে দিয়ে মাত্র সাত হাজার টাকা তিনি রাখলেন। আর আমৃত্যু বাড়িতে থাকার অধিকারটুকু ছেলের কাছে চেয়ে নিলেন। জীবন যদি নাটক হয় তাহলে এ-ঘটনা তারই একটা দৃশ্য।

অতঃপর নগেন্দ্রভূষণের হাতে এল প্রচুর টাকা। আগে থেকেই বাবুমশায়ের কলকাতায় তাঁর নামডাক ছিল। থিয়েটার ব্যবসায়ে নাম আরও ছড়িয়ে পড়ল। আঠারো শ' তিরানব্বই সালের আটাশে জানুয়ারি ম্যাকবেথ নাটক নিয়ে মিনার্ভা চালু হলো। নামভূমিকায় গিরিশ ঘোষ এবং লেডি ম্যাকবেথ তিনকড়ি।

ম্যাকবেথের পর মিনার্ভায় যেসব নাটক মঞ্চ-সফল হয় তার মধ্যে নাম করা যায় মুকুল মুঞ্জরা, আবু হোসেন ও জনা। মুকুল মুঞ্জরায় তারা ও জনার নাম-ভূমিকায় তিনকড়ির অভিনয় ছিল অনবদ্য। পরবর্তীকালে নবীন তপস্বিনীতে মল্লিকা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে দ্রৌপদী এবং করমেতি-বাঈতে নামভূমিকায়

অভিনয় করে তিনকড়ি পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পেল। তারপর মিনার্ভা উপহার দিল গিরিশ ঘোষের যুগান্তকারী সামাজিক নাটক প্রফুল্ল। আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।' প্রতিটি নাটকের অভাবনীয় সাফল্য সত্ত্বেও মিনার্ভা থিয়েটারের ভিত একদিন নড়ে উঠল। সে-যুগে থিয়েটার ব্যবসায়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। নগেন্দ্রভূষণ মুখার্জিও ব্যতিক্রম নন। তাঁর বিপুল টাকা কিভাবে জলের স্রোতের মতো ভেসে গেল সেটা আজও একটা প্রশ্নই থেকে যায়। এর পেছনে বিলাসিতা অমিতব্যয়িতা এবং ব্যবসা সম্বন্ধে উদাসীনতা অবশ্যই ছিল। হয়তো আরও কিছু ছিল। তাই তিনি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। ক্রমশ দেনার জালে জড়িয়ে পড়লেন। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর নামে একের পর এক মামলা শুরু হলো।

আন্দুলের জমিদার হরিশচন্দ্র কুণ্ডুচৌধুরীর বিধবা স্ত্রী সরলা দাসী দশ হাজার টাকার দাবী জানিয়ে নালিশ করলেন। হরিশ বেঁচে থাকতে নগেন্দ্র হাতচিঠিতে টাকা নিয়েছিলেন। নোটিশ পেয়েও নগেন্দ্র হাজির হলেন না। মামলা একতরফা ডিক্রি হয়ে গেল এবং রিসিভার নিযুক্ত হলো। আঠারো শ' ছিয়ানব্বই সালে সেই ডিক্রি জারী করে মিনার্ভা থিয়েটারে নগেন্দ্রর মালিকানার অর্ধেক ক্রোক করলেন সরলা দাসী। থিয়েটারের আসবাবপত্র ও নগেন্দ্রর হুমকা জেলার সম্পত্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো—যেন সেগুলোর বন্ধক বা বিক্রি বন্ধ থাকে। থিয়েটারের টিকিট বিক্রির অর্ধেক রিসিভারের হাতে জমা হতে লাগল। নগেন্দ্রর অংশীদার প্রথমনাথ দাস ও ম্যানেজার হরিধন দত্তর হাত-পা বাঁধা। আরও খারাপ সময়ের জন্যে তৈরি থাকলেন তাঁরা।

থিয়েটারের এই জটিল অবস্থার কথা শুনে আর-একজন পাওনাদার কালবিলম্ব না-করে হাইকোর্টে নালিশ করলেন। তাঁর নাম আশুতোষ রায়চৌধুরী। তাঁর কাছে থিয়েটার বন্ধক রেখে নগেন্দ্র সাড়ে সাত হাজার টাকা নিয়েছিলেন। তাছাড়া শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকারও থিয়েটারে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন। তিনিও হাত বাড়ালেন। নগেন্দ্রভূষণ তখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আদালতের আদেশে মিনার্ভা থিয়েটার নীলামে উঠল। কাগজে সে-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হলো। শেষে আঠারো শ' আটানব্বই সালের একত্রিশে মার্চ খুলনার জমিদার বেণীভূষণ রায় হাইকোর্টের নীলামে মিনার্ভা থিয়েটার কিনে নিলেন। মঞ্চজগৎ থেকে বিদায় নিলেন নগেন্দ্রভূষণ।

সেই সময়ে কলকাতার রঙ্গালয়ে এসেছিলেন আর-এক প্রতিভা। শিক্ষিত রুচিবান সুদর্শন যুবক। সুকণ্ঠ সুলেখক এবং সু-অভিনেতা। নাম অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। উত্তর কলকাতার হাতিবাগানে মস্ত বাড়ি। সে-যুগের লোক সেটাকে পুতুল-বাড়ি বলত। কারণ, রাস্তার ধারে বাড়ির বারান্দায় সারি সারি সিমেন্টের তৈরি রঙিন পুতুল শোভা পেত। সে-বাড়ির আজ অন্য রূপ। ওদেরই এক বংশধর হরীন্দ্রনাথ দত্তর গ্রে স্ট্রিটের বাড়ির দরজায় সেই হারানো দিনের নিদর্শন দু'টি পুতুল অতন্দ্র প্রহরীর মতো আজও দাঁড়িয়ে আছে। যাক সে-কথা। অমর দত্তর বাবা দ্বারকানাথ দত্ত ছিলেন র‍্যালি ব্রাদার্স কোম্পানির বেনিয়ান। অমরের বড়ো ভাই ছিলেন সুপণ্ডিত সুলেখক প্রখ্যাত অ্যাটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। অমর দত্ত ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন অভিনয়-পাগল এবং যৌবনের শুরুতেই বিপথগামী। তাঁর মনটা ছিল বিপ্লবী বিদ্রোহী। আঠারো শ' চুরানব্বই সালের শেষদিকের কথা। একদিন স্টার থিয়েটারে চন্দ্রশেখর নাটকে শৈবলিনীর অভিনয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শৈবলিনীর চরিত্রে অভিনয় করছিলেন তারাসুন্দরী। তারাসুন্দরীকে তাঁর বড়ো ভালো লাগল। সেই ভালোলাগার পরিণতিতে তিনি তারাসুন্দরীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। ক্রমে রাতে বাড়ি ফেরা বন্ধ করলেন। স্ত্রী হেমনলিনী ও শিশুপুত্রের কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের বাগমারির বাগানবাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন তারাসুন্দরীকে। তিনি যে কি প্রচণ্ড দুঃসাহসী ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। অমর দত্তর এই আচরণে ভাইদের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দিল। কিন্তু তিনি তখন বেপরোয়া।

বাগমারির বাগানবাড়িতে বসে অমর দত্ত থিয়েটার খোলার পরিকল্পনায় মেতে উঠলেন। তাঁর পরামর্শে তারাসুন্দরী তখন স্টার থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। অমর দত্তর সঙ্গে বেরিয়ে আসার আগে তারাসুন্দরী এক শ' চুয়ান্ন নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে মা নিত্যকালী ও বড়ো বোন কালীমণির কাছে থাকত। থিয়েটার থেকে মাইনে পেত মাসে আটাশ টাকা। সেটাই ছিল ওদের সংসারের সম্বল। নিত্যকালী ভাবতে পারেনি মেয়েটা এভাবে পালিয়ে যাবে। যাই হোক, ব্যাপারটা সেখানেই থেমে থাকেনি। অ্যাটর্নি বি. এন. মল্লিকের কাছ থেকে নিত্যকালী একটা চিঠি পেল। ইংরেজিতে লেখা চিঠি। সেই চিঠি অন্যকে পড়িয়ে সে জানতে পারল যে, তারাসুন্দরীর বেশ কিছু সোনার গয়না ও আসবাবপত্র সে আটকে রেখেছে। পত্রপাঠ সেগুলো যদি সে ফেরত না-দেয় তাহলে তারা-সুন্দরী আদালতের আশ্রয় নেবে। চিঠির বয়ান শুনে অবাক হলেও নিত্যকালী

তার কোনো উত্তর দিল না। কয়েকদিন পরে হাইকোর্ট থেকে সমন এল। তারাসুন্দরী তার নামে মামলা করেছে। নিত্যকালী দেখল এবারে আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। আদালতে হাজির হয়ে সে বললে, তারাসুন্দরীর সব অভিযোগ মিথ্যে। সে পালিয়ে যাওয়ার সময়ে তার সমস্ত গহনাপত্র নিয়ে গেছে। আইনের চোখে এখনও সে নাবালিকা। অন্যের প্ররোচনায় সে এই মিথ্যা মামলা করেছে।

আইন-আদালত সম্বন্ধে তারাসুন্দরীর কোনো ধ্যান-ধারণা ছিল না। অমর দত্ত তাকে যা বলেছেন সে তাই করেছে। ব্যাপার ঘোরালো দেখে সে মামলা থেকে সরে দাঁড়াল। বুঝতে পারল সে ভুল করেছে। ভুল শোধরাতে অমর দত্তর আশ্রয় ছেড়ে আবার সে ফিরে গেল মায়ের কাছে। আবার স্টার থিয়েটারে বহাল হলো। তখন মাইনে মাসিক বত্রিশ টাকা।

তারাসুন্দরী হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় অমর দত্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছে তখন তাঁর মুখ দেখানো দায়। বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে তিনি তারাসুন্দরীর নামে হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দিলেন। বললেন, মায়ের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্যে তারাসুন্দরী তাঁর কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়েছিল। কথা ছিল মামলা নিষ্পত্তি হলে কড়ায়-গণ্ডায় সে টাকা শোধ করে দেবে। সেই মামলায় অমর দত্তর দু' হাজার টাকা খরচ হয়েছে। অ্যাটর্নি কুমুদনাথ গাঙ্গুলীর তৈরি করা দু' হাজার টাকার একটা বিলের কপিও তিনি আদালতে দাখিল করলেন। তারাসুন্দরীও তখন লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত। সে গেল অ্যাটর্নি উইলসন মিত্র ও চ্যাটার্জির অফিসে। তাঁরা মামলার জবাব তৈরি করে দিলেন। তারাসুন্দরী বললে, ভুল করে অমর দত্তর প্রলোভনে পড়ে সে অমর দত্তর সঙ্গে তাঁর বাগমারির বাগানবাড়িতে উঠেছিল। অমর দত্ত তাকে মাসে দু' শ' টাকা মাইনের লোভ দেখিয়েছিলেন। মায়ের বিরুদ্ধে মামলার মতলব তিনিই দিয়েছিলেন। সে নিরক্ষর ও অশিক্ষিতা। মামলার বিষয়বস্তু সে কিছুই জানত না।

তারাসুন্দরীর এইসব কুৎসিত অভিযোগ অমর দত্ত নিঃশব্দে হজম করলেন। নিজের সম্মান-সম্ভ্রমের কথা ভেবে তিনি পেছিয়ে গেলেন। ফলে মামলাটা খারিজ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে তাঁর হাতে কিছু টাকা এসে গেছে। থিয়েটার খোলার দিকে তিনি মন দিলেন। একটা শখের থিয়েটার পার্টি খুললেন। নাম দিলেন ইণ্ডিয়ান থিয়েটার। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি নাটক করার পর এক রাত্রির জন্যে মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে কবি নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ নাটকাকারে

পরিবেশন করলেন। সেই নাটকে সিরাজের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় রাতারাতি খ্যাতি এনে দিল। সাধারণ রঙ্গালয়ে সেটাই তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণ। গিরিশ ঘোষের সঙ্গে দত্ত পরিবারের আত্মীয়তা ছিল। পলাশীর যুদ্ধ পরিবেশনে গিরিশ তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। সে-রাত্রে অভিনয় শেষে গিরিশ এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোককে সাজঘরে নিয়ে এলেন। তিনি কবিবর নবীনচন্দ্র সেন। গিরিশ অমর দত্তকে বললেন তোমার অভিনয় দেখে কবি মুগ্ধ। অমর দত্ত মাথা পেতে কবির আশীর্বাদ নিলেন।

ক্রমে অমর দত্ত থিয়েটার খোলার নেশায় পাগল হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে তারাসুন্দরীর সঙ্গে তিনি পুরনো ঝগড়াটা মিটিয়ে নিয়েছিলেন। একরাত্রি বেঙ্গল থিয়েটার ভাড়া নিয়ে তিনি গিরিশ ঘোষের বিষাদ নাটক অভিনয় করলেন এবং বিষাদ চরিত্রে রূপ দিলেন তারাসুন্দরী। সেই সময়ে অমর দত্ত সৌরভ নামে মাসিকপত্র প্রকাশ করেন যার কার্যালয় ছিল শোভাবাজার রাজবাড়িতে। সৌরভ অবশ্য বেশিদিন সৌরভ বিতরণ করতে পারেনি। তার অকালমৃত্যু হয়েছিল।

যাই হোক, অবশেষে অমর দত্তর মনোবাসনা পূর্ণ হলো। এমারেল্ড মঞ্চ ভাড়া নিয়ে আঠারো শ' সাতানব্বই সালের ষোল এপ্রিল তারিখে তিনি পাকাপাকি-ভাবে থিয়েটার ব্যবসায়ে নামলেন। তাঁর থিয়েটারের নাম হলো ক্লাসিক থিয়েটার। সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সেদিন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন বন্ধু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী তারাসুন্দরী। ক্রমে তাঁর দলে যোগ দিলেন মহেন্দ্রলাল বসু, অঘোরনাথ পাঠক, প্রমথনাথ দাস, ধর্মদাস সুর, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ আচার্য, কুসুমকুমারী, নয়নতারা, শরৎসুন্দরী ও সরোজিনী। প্রথম অভিনয় রজনীতে বালেশ্বরের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উপস্থিতিতে মহাসমারোহে গিরিশ ঘোষের নাটক নল দময়ন্তী ও বেল্লিক বাজার অভিনীত হলো। নল অমর দত্ত, দময়ন্তী তারাসুন্দরী ও কলি অঘোরনাথ পাঠক। পরের দিন অভিনীত হলো পলাশীর যুদ্ধ ও লক্ষ্মণ বর্জন। তারপর দক্ষযজ্ঞ ও বেল্লিক বাজার। দক্ষযজ্ঞ নাটকে দক্ষ অঘোরনাথ পাঠক, মহাদেব অমর দত্ত, সতী তারাসুন্দরী ও তপস্বিনীর ভূমিকায় কুসুমকুমারী। পরের মাসে অমর দত্তর প্রযোজনায় ও পরিচালনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী নাটক থিয়েটারের দুনিয়ায় আলোড়ন এনে দিল। প্রথম অভিনয়-রজনীতে ব্রজেশ্বর অমর দত্ত, হরবল্লভ চণ্ডীচরণ দে, ভবানী পাঠক হরিভূষণ আচার্য এবং নামভূমিকায় তারাসুন্দরী রূপদান করে-ছিলেন। এ-নাটক অমর দত্তকে দিয়েছিল সাফল্যের জয়তিলক এবং অপরিমিত অর্থ।

পরের বছর ক্লাসিক থিয়েটারে দোললীলা নাটক খোলা হলো। সেযুগের অপরাজেয় নৃত্যশিল্পী নেপা বসু তখন ক্লাসিকে যোগ দিয়েছেন। দোললীলা গীতি-নাট্যের সাফল্য দেখে অমর দত্ত আলিবাবা নামালেন। আলিবাবার নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। সেটাই তাঁর প্রথম মঞ্চসফল নাটক। সে-নাটকের ভূমিকালিপিতে ছিলেন কাসিম হরিভূষণ আচার্য, আলিবাবা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হোসেন অমর দত্ত, আবদাল্লা নৃপেন বসু, মুস্তাফা অক্ষয় চক্রবর্তী, সাকিনা ভূষণ-কুমারী, ফতিমা রানীসুন্দরী ও মর্জিনা কুসুমকুমারী।

আলিবাবা নাটকের অসাধারণ সাফল্যের পর থেকেই অমর দত্ত নতুন নাটক খুঁজছিলেন। গিরিশ ঘোষ ছাড়া তখন নাট্যকার কোথায়? কিন্তু গিরিশ তো নাগালের বাইরে। তখন মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশ ঘোষের জয়জয়কার। গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল নাটক দেখতে সেখানে তখন লোক ভেঙে পড়ছে। সেই অবস্থায় অমরেন্দ্রনাথ গিরিশকে অনুরোধ করলেন ক্লাসিকে যোগ দিতে। গিরিশ ঘোষ রাজি হলেন। আঠারো শ' নিরানব্বই সালের মার্চ মাসে দু'জনে একটা চুক্তিপত্রে সই করলেন। চুক্তিপত্রের প্রধান শর্ত হলো, আগামী তিন বছর গিরিশ ক্লাসিক থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। তিন বছরের মধ্যে তিনি আর-কোথাও অভিনয় করতে পারবেন না। নাটক লেখার বা নাটকের অভিনয়-স্বত্ব দেওয়ার ব্যাপারে তিন বছর তিনি কারও সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারবেন না। কেবলমাত্র ক্লাসিকের জন্যেই তিনি নাটক লিখবেন। তাছাড়া ক্লাসিকে তিনি নিয়মিত অভিনয় করবেন। সেলামীর একটা মোটা অঙ্ক ছাড়া মাইনে ধার্য হলো মাসিক দু' শ' টাকা। দানীবাবুও বাবার সঙ্গে ক্লাসিক থিয়েটারে যোগ দিলেন। গিরিশের নাট্যরূপায়িত মেঘনাদবধ নাটক খোলা হলো। ক্লাসিকে এর পরের নাটক মুকুল মুঞ্জরা ও প্রফুল্ল। প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ গিরিশ ঘোষ, রমেশ চূনীলাল দেব, সুরেশ দানীবাবু, ভজহরি অমর দত্ত, উমা হরিদাসী, জ্ঞানদা তিনকড়ি জগমণি জগত্তারিণী ও প্রফুল্ল কুসুমকুমারী। এ-নাটক ক্লাসিককে প্রচুর পয়সা দিয়েছিল। তাই দেখে মিনার্ভা ভাবনায় পড়ল। মহেন্দ্রলাল বসু ও অর্ধেন্দু মুস্তাফী থিয়েটারকে বাঁচাতে জোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। যেমন করে হোক অমর দত্তকে দাবিয়ে রাখতে হবে।

ক্লাসিক থিয়েটারে একটা বছর থাকার পর অমর দত্ত ও গিরিশ ঘোষের সম্পর্কে ফাটল ধরল। বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে গিরিশ চুক্তির শর্ত অগ্রাহ্য করে

মিনার্ভায় চলে গেলেন। অমর দত্ত দেখলেন এটা আইন ও সম্মানের প্রশ্ন। তিনি গিরিশ ঘোষের নামে হাইকোর্টে মামলা করলেন। ওঁদের দুজনের মাঝে যে-চুক্তি হয়েছিল তার একটা প্রধান শর্ত ছিল সময়সীমার আগে চলে গেলে গিরিশ ঘোষ তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। অমর দত্ত তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করলেন। তিনি আরও বললেন, গিরিশ ঘোষ ক্লাসিকে চাকরি নেওয়ার পর সৎ ও সন্তোষজনকভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেননি। বিনা নোটিশে তিনি থিয়েটারে আসা বন্ধ করেছেন। তাছাড়া তিনকড়িকে নিয়মিত অভিনেত্রী হিসাবে বহাল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি এক হাজার টাকা নিয়েছেন। গিরিশ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়িও থিয়েটারে অনুপস্থিত। আদালতে মামলা উঠতে বিচারপতি সেল চুক্তিপত্রটি দেখে গিরিশ ঘোষের ওপর রুল জারি করলেন। আদালতে হাজির হয়ে তাঁকে চুক্তিভঙ্গের কৈফিয়ৎ দিতে হবে। অন্তর্বর্তী সময়ে অন্য কোথাও তিনি অভিনয় করতে পারবেন না।

মামলায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলে থিয়েটার মহলে গিরিশ ঘোষের নাম ছিল। গিরিশ ঘোষ কোনোদিন এত বেকায়দায় পড়েননি। জেরার মুখে পড়ে তিনি নাজেহাল হলেন। বুঝলেন ফাঁকি, দিয়ে মামলার কঠিন জাল কেটে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা তাঁর নেই। বাধ্য হয়ে একটা রফায় আসতে হলো তাঁকে। হিসাবনিকাশ করে প্রথমে তিনি উনিশ শ' টাকা দিলেন এবং আরও তেরো শ' টাকা তিন মাসের মধ্যে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। অমরেন্দ্রনাথের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন জ্যাকসন, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, রমেশ মিত্র ও ব্যারো। গিরিশ ঘোষের হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন চারুচন্দ্র মিত্র, গ্রিফিথ ইভান্স ও গার্থ। থিয়েটারকে ঘিরে কলকাতা হাইকোর্টে এতবড়ো মামলা এর আগে হয়নি। এমন শোচনীয় পরাজয়ের কথাও গিরিশ ঘোষ আগে ভাবেননি।

মামলা মিটে যাওয়ার পর গিরিশ ঘোষ মিনার্ভায় ফিরে গেলেন। সঙ্গে তিনকড়ি ও অঘোরনাথ পাঠক। সেটা উনিশ শ' এক সাল। সেই বছরে রঙ্গজগতে নতুন চমক আনলেন অমরেন্দ্রনাথ। রঙ্গালয় নামে পত্রিকা প্রকাশ তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। এই পত্রিকা তিনি চার বছর চালিয়েছিলেন। প্রচুর আর্থিক ক্ষতিও হয়েছিল তাঁর। এই কাগজ নিয়ে তাঁকে দুটি মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়তেও হয়েছিল। একটি মামলা এনেছিলেন নবযুগের সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত ও অপরটি বসুমতীর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সেই বছরের আর-এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বেঙ্গল থিয়েটারের বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের লোকান্তর। নাট্যকার,

অভিনেতা ও পরিচালক—এই তিন ভূমিকায় তিনি যে-যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে গেছেন তার তুলনা মেলা ভার। গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও তিনি হার মানেননি। বিহারীলালের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল।

বেঙ্গল থিয়েটারের বন্ধ দরজা খুললেন নীলমাধব চক্রবর্তী। এর আগে তিনি ছিলেন স্টারে। নিজস্ব থিয়েটারের নাম দিলেন অরোরা। ব্যবসা তেমন জমল না। শেষ পর্যন্ত ক্লাসিক থেকে তারাসুন্দরীকে ভাঙিয়ে আনলেন। তাতে অরোরার মর্যাদা বাড়ল এবং বিক্রিও বাড়ল। অর্ধেন্দু মুস্তাফীও নিজেকে অরোরার সঙ্গে যুক্ত করলেন। তাঁর নির্দেশনায় মনোমোহন রায়ের লেখা রিজিয়া নাটকই অরোরাকে বাঁচিয়েছিল। সেই নাটকের নামভূমিকায় তারাসুন্দরীর অভিনয় তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় অবদান। তবুও অরোরার আয়ু দু' বছরের বেশি স্থায়ী হলো না। থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। বেঙ্গল মঞ্চে নতুন মালিক এলেন। গোপাল-লাল শীলের ভাগনে গিরিমোহন মল্লিক। থিয়েটারের নাম দিলেন ইউনিক। দানীবাবু সেখানে যোগ দিলেন। এই সময়ে অমর দত্তর অকৃত্রিম বন্ধু শক্তিমান নট মহেন্দ্রলাল বসু মারা গেলেন।

গিরিশ ঘোষ মিনার্ভা ছেড়ে দিলেন। অমর দত্তর সঙ্গে পুরানো বিবাদটা ভুলে আবার ক্লাসিকে ফিরে এলেন। সঙ্গে তিনকড়িকে নিয়ে এলেন। অরোরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তারাসুন্দরীও চলে এসেছিল। ওদিকে তখন মিনার্ভার অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে। পাওনাদারের তাগাদায় থিয়েটার বন্ধ হতে চলেছে। কোর্ট থেকে রিসিভার বসে গেছে। থিয়েটারের জন্যে লেসীর খোঁজ চলছে। সেই দেখে অমর দত্ত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রচুর টাকার দায় নিয়ে তিনি মিনার্ভা লীজ নিলেন। এটাও তাঁর জীবনের আর-একটা ভুল পদক্ষেপ। উনিশ শ' তিন সালের সাত নভেম্বর তারিখে রঘুবীর নাটক নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করলেন। নিজে সেজেছিলেন রঘুবীর, অনন্ত রাও রাধামাধব কর।

ওদিকে ক্লাসিক থিয়েটারে তখন নতুন নাটকের মহলা চলছে। উনিশ শ' চার সালের তিরিশে এপ্রিল তারিখে গিরিশ ঘোষের নতুন নাটক সৎনাম খোলা হলো। ভূমিকালিপিতে ছিলেন অমর দত্ত, দানীবাবু, কুসুমকুমারী, পান্নারানী, হরিসুন্দরী প্রভৃতি। কয়েকদিন এই নাটক চলার পর মুসলমান সমাজের এক বিশাল জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে থিয়েটারের সামনে জমায়েত হলো। তাদের প্রতিবাদের কণ্ঠ সোচ্চার। কারণ এ-নাটকে তাদের কুৎসা রটনা করা হয়েছে। উত্তেজিত বিশাল

জনতা থিয়েটার ঘিরে ফেলল। নাটকের অভিনয় বন্ধ হলো। সমসাময়িক পত্রিকা মিহির ও সুধাকর লিখল: গিরিশবাবুর সৎনাম মহানাটক লইয়া গত 'শনিবার দারুণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। কুৎসাপূর্ণ নাটক অভিনয় করিতে দিব না বলিয়া কলিকাতা শহরে প্রায় ২।৩ সহস্র মুসলমান ক্লাসিক থিয়েটারের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিল। শহরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। নাটক অভিনয় বন্ধ হইয়াছিল।

অমর দত্ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। সৎনাম নাটক নামানোর ব্যাপারে তিনি প্রচুর টাকা খরচ করেছেন। তার বেশিটাই ধার করা। প্রতিকূল ভাগ্যের জন্যে একটা বিরাট দেনার বোঝা তাঁর মাথায় চেপে গেল। অগত্যা পুরনো সাজ-সজ্জা সম্বল করে রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা তরনীসেন ও বিক্রমাদিত্য নাটকের অভিনয় শুরু করলেন। কিন্তু দর্শক পেলেন না। এত বৃহৎ আয়োজন সত্ত্বেও এবং শক্তি-শালী অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহায়তা পেয়েও তিনি সুবিধা করতে পারলেন না। আসলে অমরেন্দ্রনাথের নজরটা ছিল খুব উঁচু। প্রথম থেকেই তিনি রাজকীয়ভাবে নাট্যপ্রযোজনা শুরু করেছিলেন। তার ওপর তিনি ছিলেন বেহিসেবী এবং অত্যন্ত অমিতব্যয়ী। অতবড়ো শক্তিমান অভিনেতা, যিনি মাত্র কয়েকটা বছরে যশের শীর্ষে উঠেছিলেন, তিনি তখন ঋণগ্রস্ত। মিনার্ভার লীজ তিনি ছেড়ে দিলেন। সে-ব্যাপারেও একটা বিরাট দেনার অঙ্ক তাঁর মাথায় চেপে গেছে। অমর দত্তর অবস্থা দেখে এগিয়ে এল আগ্রাসী পাওনাদারের দল। থিয়েটার চালানো দায় হয়ে উঠল।

ক্লাসিক থিয়েটারের বাড়িটা ছিল কলুটোলার গোপাললাল শীলের সম্পত্তি। গোপাললাল বেঁচে থাকতে অমর দত্ত সেটা মাসিক পাঁচ শ' টাকায় ভাড়া নিয়েছিলেন। রুচিবান মানুষটি মনের মতো করে থিয়েটার সাজিয়েছিলেন। পাশাপাশি মঞ্চ তখন তাঁকে হিংসা করত। প্রথম থেকেই খরচের কোনো কার্পণ্য করেননি তিনি। খরচ সামলাতে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রঙ্গালয় পত্রিকা চালাতে অনেক টাকা ঘাটতি হয়েছিল। সেই সময়ে উনিশ শ' দু' সালে বেণীভূষণ রায়ের কাছে থিয়েটার বাঁধা রেখে অমর দত্ত তিন হাজার টাকা ধার করলেন। কিছুদিন পরে প্রিয়নাথ দাসের কাছে দ্বিতীয় দফায় থিয়েটার বাঁধা দিয়ে ধার নিলেন সাড়ে সাত হাজার টাকা। দু' ক্ষেত্রেই সুদের হার ছিল বার্ষিক শতকরা আঠারো টাকা। দুজনকে চড়া সুদ দিয়ে থিয়েটার চালান অসম্ভব হয়ে উঠল। তখন অমর দত্ত ওদের নামে একটা মামলা এনে নিজেই আদালতের সাহায্য চাইলেন। বললেন, এই চড়া সুদ আর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অমর দত্তর অ্যাটর্নি ছিলেন ম্যানুয়েল আগার-

ওয়ালা অ্যাণ্ড কোম্পানি ও অপর পক্ষে কুমুদনাথ গাঙ্গুলী। অমর দত্ত বললেন, সুদ ও আসলে আমি অনেক টাকা দিয়েছি কিন্তু বেণীভূষণ ও প্রিয়নাথ আমাকে কোনো হিসেব দিচ্ছেন না।

বেণীভূষণ ও প্রিয়নাথ বললেন, অমর দত্ত আমাদের পাওনা টাকা ফাঁকি দিতে চান। থিয়েটারের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। অভিনেতারা নিয়মিত মাইনে পান না। তাছাড়া বহু টাকা বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে একথাও তাঁরা শুনেছেন। এই অবস্থায় একজন রিসিভার নিয়োগের আবেদন জানালেন তাঁরা। বিচারপতি সেল একটা রফায় মামলাটা মিটিয়ে দিতে চাইছিলেন। তিনি চাইছিলেন থিয়েটার চলুক। অমর দত্ত বাঁচুক। ঠিক সেই সময়ে মনমোহন পাঁড়ে আদালতে এসে একটা দরখাস্ত পেশ করে বসলেন। তাঁর পাওনা দু' হাজার টাকা। তিনিও এই মামলায় পার্টি হতে চাইলেন। প্রিয়নাথ দেখলেন ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। তিনি মনমোহন পাঁড়েকে দু' হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। অমর দত্তর সঙ্গে আপস রফাটা তাঁরা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলেন। হিসাবে পাওনার অঙ্ক দাঁড়ালো দশ হাজার টাকা। মামলাটা তখন বিচারপতি সেল-এর কাছ থেকে উডরফ-এর কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। থিয়েটারের রিসিভার নিযুক্ত হলেন অতুলচন্দ্র রায়। অমর দত্ত আদালতের কাছে অঙ্গীকার করলেন পনেরো দিনের মধ্যে তিনি বকেয়া ভাড়া শোধ করবেন। থিয়েটারের খরচ চালিয়ে এবং অমর দত্তকে মাসিক এক শ' টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে বাকি টাকাটায় দেনা শোধ করা হবে। রিসিভার এইরকম একটা ব্যবস্থা করলেন।

আপাতত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন অমর দত্ত। থিয়েটার চালু থাকবে এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। আবার তিনি আশায় বুক বেঁধে দাঁড়ালেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না! তাঁর সেই দুর্দিনে গিরিশ ঘোষ তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। চলে গেলেন আরও অনেক নট-নটী। আদালতের কাছে বকেয়া বাড়ি-ভাড়া পরিশোধের যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন তা রাখতে পারলেন না। উপরন্তু আরও নতুন মামলা তাঁকে পাকে-পাকে জড়িয়ে ফেলল। রামলাল চ্যাটার্জি ও ক্ষেত্রনাথ চ্যাটার্জী নামে দুই মহাজন হাইকোর্টে নালিশ ঠুকে দিলেন। তাঁদের সঙ্গে চুক্তি ছিল প্রতি অভিনয় রাত্রের মহিলা আসনের টিকিট বিক্রির টাকা তাঁরা নেবেন। অতুলচন্দ্র রায় রিসিভার নিযুক্ত হওয়ায় ওঁদের টাকা আদায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাইকোর্টে রামলাল বললেন, বেণীভূষণ ও প্রিয়নাথের সঙ্গে অমর দত্তর মামলাটা একটা সাজানো ব্যাপার। অন্যান্য মহাজনদের ফাঁকি দেওয়ার

জন্যেই অমর দত্ত এই কৌশল নিয়েছেন। সেই মামলায় রামলালরা এগারো হাজার টাকার ডিক্রি পেলেন। আদালতের আদেশে ফিরে পেলেন মহিলা আসনের টিকিট বিক্রির অধিকার। তারিখটা উনিশ শ' পাঁচ সালের বিশে মার্চ।

এত গোলমালের মধ্যেও ক্লাসিক থিয়েটার চলছিল। দর্শকও টানছিল। যদিও তরঙ্গসঙ্কুল মহানদীতে দোদুল্যমান নৌকার মতো তার অবস্থা। অমর দত্ত নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন চুনীলাল দেব ফিরে এসেছেন। নতুন নাটক নামানো হলো প্রেমের পাথার ও সংসার। কিন্তু একের পর এক মামলার জালে জড়িয়ে অমর দত্ত দিশাহারা হয়ে পড়লেন। চিৎপুর রোডের আর-এক পাওনাদার পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দিলেন। তাঁর পাওনা টাকা তামাদি হতে চলেছে। তিনি অমর দত্তর একজন শুভাকাঙ্খী ছিলেন কিন্তু ক্লাসিক থিয়েটারের জীবনদীপ কম্পমান দেখে তিনি কিছুতেই আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। আবার অমর দত্তকে আদালতে ছুটতে হলো। এখানেই শেষ নয়। দেওয়ানি মামলার সীমানা ছাড়িয়ে অদৃষ্ট অমর দত্তকে টেনে নিয়ে গেল ফৌজদারি আদালতে। মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নামে একজন লোক কলকাতার চীফ প্রেসি-ডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের কাছে অমর দত্তর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগ আনলেন। অমর দত্তকে দাঁড়াতে হলো আসামীর কাঠগড়ায়। তখন তাঁর মনোবল একেবারে ভেঙে পড়েছে। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন। তাঁর সম্মান তখন ধুলোয় লুটোতে বসেছে। উনিশ শ' পাঁচ সাল তাঁর চরম সঙ্কটের কাল। অসামান্য প্রতিভাধর নট-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন ভগ্নস্বাস্থ্য, সহায়সম্বলহীন। আয়ের চেয়ে দেয় সুদের পরিমাণ অনেক বেশি। তখন তিনি নিজের থিয়েটারে ঢুকতে পারছেন না। তার সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি পাওনাদারের কবলে। এই অবস্থায় উপায়ান্তর না-দেখে বাঁচার তাগিদে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হলেন। তিনি ইন্‌সলভেন্সি চান। তিনি চান দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাতে। বিরাট দত্ত পরিবারের সন্তান অপরাজের নট অমর দত্তর তখন নিজের বলতে আর কিছুই নেই। বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যের ওপর তিনি তখন নির্ভরশীল। দেউলিয়া হওয়ার জন্যে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করলেন উনিশ শ' পাঁচ সালের ছাব্বিশে এপ্রিল তারিখে। হাইকোর্ট থেকে সমস্ত পাওনাদারদের নোটিশ দেওয়া হলো। কেউ চুপ করে রইল, কেউ-বা বিরোধিতা করল।

দেউলিয়া মামলার শুনানীর সময়ে ক্লাসিক থিয়েটারের বাড়িওয়ালার তরফ

থেকে বকেয়া ভাড়া আদায় ও উচ্ছেদের জন্যে অমর দত্তর নামে আবার একটা মামলা রুজু হলো। তারিখটা উনিশ শ' ছ' সালের মার্চ মাস। বাড়িওয়ালা গোপাললাল শীল এর চারবছর আগে লোকান্তরিত। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রী নয়নমঞ্জরী ও কুমুদিনীর মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে তখন হাইকোর্টে মামলা চলছে। সেই মামলায় অ্যাডমিনিসট্রেটর নিযুক্ত হয়েছিলেন রবার্ট বেলচেম্বার্স। পদাধিকার-বলে তিনিই গোপাললালের স্ত্রীদের হয়ে অমর দত্তর নামে হাইকোর্টে নালিশ করলেন। বিচারপতি ফ্র্যাঙ্ক বডিলির এজলাসে মামলাটা ডিক্রি হয়ে গেল। টাকার অঙ্ক মামলার খরচ সমেত প্রায় তেরো হাজার। অমর দত্ত দাঁড়িয়ে হেরে গেলেন।

ওদিকে দেউলিয়া মামলার শুনানীও শেষ। আদালত থেকে অমর দত্তকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে। পাওনাদারের তালিকায় রবার্ট বেলচেম্বার্সের নামটাও যোগ হলো। আদালত থেকে আদেশ হলো পূর্বতন রিসিভার অতুলকৃষ্ণ রায় এক সপ্তাহের মধ্যে ক্লাসিক থিয়েটারের বাড়ি বেলচেম্বার্সের হাতে তুলে দেবেন। আদালতের আদেশ মেনে অতুল রায় থিয়েটার-বাড়ি অর্পণ করলেন। থিয়েটার জগতে অমর দত্তর দুঃখ-সুখ মেশানো একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি হলো। ঐতিহাসিক ক্লাসিক থিয়েটারের পাদপ্রদীপ নিভে গেল।

ক্লাসিক থিয়েটারের পতনের ঠিক একবছর আগে নবপর্যায়ে বিপুল উৎসাহে শুরু হয়েছিল মিনার্ভার পদযাত্রা। একের পর এক হাতবদল হয়ে মিনার্ভা তখন মনমোহন পাঁড়ের মালিকানাধীন। সঙ্গে তাঁর অংশীদার আইনবিদ্ মহেন্দ্র মিত্র। হরগৌরী নাটক নিয়ে মিনার্ভার শুভ সূচনা হলো। তারপর গিরিশ ঘোষের সাড়া জাগানো সামাজিক নাটক বলিদান মঞ্চস্থ হলো। সে-নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় গিরিশ ঘোষ, দুলালচাঁদ দানীবাবু, মোহিত ক্ষেত্র মিত্র, কিরণময়ী কিরণবালা। কয়েকদিন পরে উদীয়মানা অভিনেত্রী সুশীলাবালা যোগ দিলেন। এলেন অর্ধেন্দু-শেখর মুস্তাফী। মনমোহন পাঁড়ে ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ করলেন অপরেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। অপরেশ তখন প্রতিশ্রুতিবান সুপুরুষ এক যুবক। থিয়েটারের ব্যাপারে অপরেশের ছিল আবাল্য আকর্ষণ। কৈশোর শেষ হতেই তিনি হাজির হয়েছিলেন রঙ্গালয়ের অঙ্গনে। সে-সময়ে অনেকেই তাঁকে এই পিচ্ছিল পথে আসতে মানা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় রাজকৃষ্ণ রায়ের। কিন্তু কোনো নিষেধ কোনো বাধা অপরেশ মানেননি। মানেননি বলেই

আমরা পেয়েছিলাম এক সফল নাট্যকার এবং শক্তিমান অভিনেতাকে। একাধারে নট ওনাট্যকার হিসাবে গিরিশ ঘোষের পর একমাত্র অপরেশের নামই স্মরণযোগ্য। মনমোহন পাঁড়ের আগে মিনার্ভা থিয়েটার যখন চুনীলাল দেবের হাতে ছিল তখনই সংগঠক ও অভিনেতা হিসাবে তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

ভাগ্যবিপর্যয়ে ক্লাসিক থিয়েটার উঠে যাওয়ার পর অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন। এখনকার গ্রেস সিনেমার নাম তখন ছিল কার্জন মঞ্চ। কিছুদিন বসে থাকার পর অমর দত্ত কার্জন মঞ্চ ভাড়া নিয়ে গ্র্যাণ্ড থিয়েটার নাম দিয়ে পেশাদারী অভিনয় শুরু করলেন। নাটক মঞ্চস্থ হলো পৃথ্বীরাজ। তিনি নিজে রূপ দিলেন নামভূমিকায়, জয়চাঁদের চরিত্রে চুনীলাল দেব ও সংযুক্তা কুসুম-কুমারী। সেখানে বেশিদিন তিনি চালাতে পারলেন না। অত্যাধিক পরিশ্রমে ও মানসিক চাপে তখন তিনি অসুস্থ। আশ্রয় নিয়েছেন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের পৈত্রিক বাড়িতে। তখন বোধহয় তিনি চিত্তশুদ্ধির চিন্তা করছেন। থিয়েটারের নেশায় পাগল হয়ে স্ত্রী হেমনলিনীকে তিনি কম অবহেলা করেননি! সেই পতি-পরায়ণা স্ত্রী নিঃসঙ্কোচে নিজের গয়না স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছেন দেনা শোধ করার জন্যে। অনুতাপের আগুন তখন অমর দত্তর শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কিছুটা সুস্থ হয়ে উনিশ শ' সাত সালে তিনি স্টার থিয়েটারে সহযোগী ম্যানেজার হিসাবে যোগ দিলেন। কুসুমকুমারীও তাঁর সঙ্গে এলেন। বহুদিন পরে চন্দ্রশেখর নাটকে প্রতাপের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করলেন। শৈবলিনীর ভূমিকায় কুসুমকুমারী।

অমর দত্তকে সামনে রেখে স্টার থিয়েটার মিনার্ভার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামল। গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল একযোগে দুটো থিয়েটারেই চলতে লাগল। মিনার্ভায় যোগেশের ভূমিকায় গিরিশ ঘোষ, স্টারে অমৃতলাল মিত্র। মিনার্ভায় রমেশ অর্ধেন্দু মুস্তাফী, স্টারে অমৃতলাল বসু। মিনার্ভায় প্রফুল্ল সুশীলাবালা, জ্ঞানদা তারাসুন্দরী, স্টারে ও-দুটি ভূমিকায় যথাক্রমে কুসুমকুমারী ও বসন্তকুমারী। এই সময়ে মিনার্ভা নতুন নাটক নামানো স্থির করল। গিরিশ ঘোষ ঐতিহাসিক নাটক লিখলেন সিরাজদৌলা। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট অনেকদিন আগেই চালু হয়েছিল। পুলিশের দপ্তরে ধর্না দিয়ে অনেক অদল বদল করে নাটকটিকে ছাড়পত্র দেওয়া হলো। সেই নাটকের কুশীলব ছিলেন গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, ক্ষেত্র মিত্র, তারকনাথ পালিত, তারাসুন্দরী, সুশীলাবালা ও ধীরাবালা। এর পরে

মিনার্ভায় অভিনীত হয়েছিল গিরিশ ঘোষের আর-একটি ঐতিহাসিক নাটক মীর-কাশিম। মনমোহন পাঁড়ের তখন বোলবোলা অবস্থা।

ইতিপূর্বে থিয়েটার ব্যবসায়ে বড়োলোক হওয়ার আশায় বা অন্য কোনো নেশায় যাঁরা টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা একে একে হারিয়ে গেলেন। খুলনা থেকে এসেছিলেন প্রিয়নাথ বসু ও বেণীভূষণ রায়। অনেক টাকা ঢেলে তাঁরা নিজেদের যুক্ত করেছিলেন ক্লাসিক থিয়েটারের সঙ্গে। ক্লাসিক থিয়েটারের পতনের পর তাঁরা ফিরে গেলেন দেনার বোঝা মাথায় নিয়ে। অবস্থার বিপাকে প্রিয়নাথকে মনমোহন পাঁড়ের কাছে হাত পাততে হয়েছিল। টাকা শোধ দিতে না-পারায় মনমোহন হাইকোর্টে মামলা করলেন প্রিয়নাথের নামে। সুদে-আসলে আড়াই হাজার টাকা পাওনা। সমন পেয়েও প্রিয়নাথ হাজির হলেন না। মামলা এক-তরফা ডিক্রি হয়ে গেল। মনমোহন খুলনায় সেই ডিক্রি জারি করে টাকা আদায় করলেন।

টাকার প্রয়োজনে বেণীভূষণ রায়ও মনমোহন পাঁড়ের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। হাতচিঠিতে তিনি পাঁচ হাজার টাকা ধার করেছিলেন। তাঁর নামে মামলা করেও ছ' হাজার টাকার ডিক্রি পেলেন মনমোহন। কিন্তু টাকা আদায়ের আগেই বেণী-ভূষণের মৃত্যু হয়। তার ছেলেরা পিতৃঋণ শোধ করে।

মনমোহন পাঁড়ের ধ্যানজ্ঞান তখন মিনার্ভা থিয়েটারের। স্টারকে দমিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর। গিরিশ ঘোষকে দিয়ে নতুন নাটক লেখালেন ছত্রপতি শিবাজী। মিনার্ভার এই আয়োজন দেখে স্টার নতুন নাটকের কথা ভাবতে লাগল। তখন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অর্থাৎ ডি. এল রায়ের খুব নামডাক। উচ্চশিক্ষিত, উচ্চ পদাধিকারী এবং সুপণ্ডিত। একাধিক নাটক রচনা করে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁকে দিয়ে স্টার রানা প্রতাপ নাটক লেখালো। তারপর সাড়ম্বরে সে-নাটক খোলা হলো। প্রধান প্রধান ভূমিকায় ছিলের অমৃতলাল বসু, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, নরীসুন্দরী ও বসন্তকুমারী। মাত্র কয়েকরাত্রি অভিনয়ের পর স্টারের সঙ্গে ডি. এল. রায়ের মতান্তর হলো। রানা প্রতাপ নাটক তিনি স্টারের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মিনার্ভায় দিলেন। মনমোহন পাঁড়ে আনন্দিত, উৎফুল্ল। ভূমিকালিপি তৈরি হলো। নামভূমিকায় দানীবাবু, শাক্ত সিংহ অপরেশ মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বিরাজ অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফী, দৌলত তারাসুন্দরী ও মেহেরউন্নিসার ভূমিকায় সুশীলাবালা। উনিশ শ' সাত সালের চব্বিশে

সেপ্টেম্বর রানা প্রতাপ নাটকের শুভ উদ্বোধনের দিন ঘোষিত হলো। পথে পথে পোস্টার পড়ল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বের হলো। উদ্বোধনের ঠিক দু'দিন আগে মনমোহন পাঁড়ে একখানি চিঠি পেলেন রানা প্রতাপের নায়িকা সুশীলা-বালার কাছ থেকে। সুশীলা লিখেছে :

মহাশয়, বিগত ১৩১১ সালের চৈত্র মাসে আপনার থিয়েটারে অভিনেত্রীর কার্যে আমি নিযুক্ত হই। ১৩১৩ সালে পৌষ মাসে ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ আমাকে বাৎসরিক ১০০০৲ টাকা বোনাস ও মাসিক ১২০৲ টাকা বেতনে এক বৎসরের এগ্রিমেন্টে তাঁহাদের থিয়েটারে যোগদান করার প্রস্তাব করেন। আমি সে প্রস্তাবে সম্মত হই। এবং একখণ্ড রীতিমত স্ট্যাম্পযুক্ত এগ্রিমেণ্ট পত্রে নিজের নামও সহি করি। সে কথা জানিতে পারিয়া আপনার পরম মিত্র ও এক্ষণে অংশীদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় পরে সে এগ্রিমেণ্টপত্র নষ্ট করিয়া আমাকে নানাবিধ প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া আপনার মিনার্ভা থিয়েটারে থাকিতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে আমি মিনার্ভা থিয়েটার হইতে ১০০০৲ টাকা বোনাস ও মাসিক ১১০৲ টাকা বেতন পাইব এবং মিনার্ভা থিয়েটারের তদানীন্তন নাট্যাচার্য বঙ্গের নাটগুরু শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের শিক্ষাধীনে থাকিয়া আমার শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইবে।

এই সকল কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া আমি মিনার্ভা থিয়েটারে থাকিতে আর কোন আপত্তি করি নাই। পরে আপনি ও উক্ত মহেন্দ্রবাবু একখানি স্ট্যাম্পে এগ্রিমেণ্ট পত্র লিখিয়া আনেন এবং আমাকে তাহা দেখিবার অবসরমাত্র না দিয়া তাহাতে আমার দস্তখত করাইয়া লয়েন। আমিও সরলান্তকরণে কোন-রূপ সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া তাহাতে সহি করিয়া দিই। অল্পদিন হইল আমি সেই এগ্রিমেন্টের কপি পাইতে সমর্থ হইয়াছি। তাহাতে যাহা লেখা আছে এক্ষণে দেখিতেছি তাহা নিতান্ত একদেশদর্শী বলিয়া মনে হয়। তাহাতে আমার স্বপক্ষে কিছুমাত্র লেখা হয় নাই এবং আমাকে তাহা দেখিতে দেওয়া হয় নাই।...যতদিন নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মিনার্ভায় ছিলেন, ততদিন আমি থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করি নাই।... স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া যাওয়ায় আমি থিয়েটারের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। তদ্ভিন্ন আমার সম্বন্ধে যে সকল বিবেচনা করিবেন বলিয়া মহেন্দ্রবাবু বাচনিক প্রতিশ্রুত ছিলেন তাহা কার্যত ঘটিয়া উঠে নাই। এই সকল নানা কারণেও আমি মিনার্ভা থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি।

সবিশেষে বক্তব্য, আপনাদের প্রদত্ত এক হাজার টাকা বোনাস আমি ফেরত দিতে প্রস্তুত আছি। অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট লোক প্রেরণ করিলে আমি উক্ত বোনাস ফেরত দিব। আমার এই ত্যাগপত্র মঞ্জুর করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিবেন।

ইতি সন ১৩১৪ সাল তারিখ ৬ই আশ্বিন।

শ্রীমতী সুশীলাবালা দাসী

সুশীলার চিঠি পেয়ে মনমোহন পাঁড়ে বিস্মিত ও হতবাক। হতাশায় অপমানে তিনি ভেঙে পড়লেন। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না এই চক্রান্তের পিছনে স্টার থিয়েটারের অদৃশ্য হাত রয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সুশীলার ভূমিকায় অন্য কাউকে তৈরি করে নির্দিষ্ট রাত্রে নাটকের উদ্বোধন অসম্ভব। ফলে নির্ধারিত রাতে অন্য নাটক অভিনীত হলো। যারা আগাম টিকিট কিনেছিল তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হলো। মহেন্দ্র মিত্র বললেন, এখনি সুশীলার নামে মামলা করতে হবে। যে কথা সেই কাজ। পরের দিন সুশীলাবালার নামে হাইকোর্টে মামলা রুজু হলো দশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করে। মনমোহন পাঁড়ে আর্জির সঙ্গে দাখিল করলেন সুশীলার সই-করা চুক্তিপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত মনমোহন পাঁড়ে, প্রোপ্রাইটর মিনার্ভা থিয়েটার,

আমি সন ১৩১১ সালের চৈত্র মাস হইতে আপনার থিয়েটারে অভিনেত্রীর কার্য করিয়া আসিতেছি। অদ্য হইতে তিন বৎসরকাল আপনার থিয়েটারে অভিনেত্রীর কার্য করিব অঙ্গীকার করায় আপনি আমাকে এককালীন এক হাজার টাকা দিতে স্বীকৃতি হওয়ায় আমি অত্র এগ্রিমেণ্ট পত্র সম্পাদন করিয়া লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে—

১। আমি অদ্য হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত মাসিক একশত দশ টাকা বেতনে আপনার থিয়েটারে অভিনেত্রীর কার্য করিব।

২। অদ্য হইতে তিন বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৩১৬ পৌষ মাসের মধ্যে আমি আপনার থিয়েটার পরিত্যাগ করিতে বা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে অন্য কোন সাধারণ বা প্রাইভেট থিয়েটারে যোগদান করিতে বা কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিব না।

৩। আমি আপনার নিকট হইতে বোনাস স্বরূপ নগদ এক হাজার টাকা বুঝিয়া পাইলাম। প্রকাশ থাকে যে আমি অদ্য হইতে তিন বৎসর মধ্যে কোন কারণে আপনার থিয়েটার পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এইরূপ

প্রতিশ্রুত হইয়া অত্র এগ্রিমেণ্ট পত্র সম্পাদন করিয়া না দিলে আপনি কখনই আমাকে উক্ত একহাজার টাকা দিতেন না এবং উক্ত টাকা না পাইলে আমার অত্যন্ত ক্ষতি হইত।

এতদর্থে সজ্ঞানে সুস্থচিত্তে ও সরলান্তকরণে অত্র এগ্রিমেণ্ট পত্র সম্পাদন করিলাম। ইতি

শ্রীমতী সুশীলাবালা দাসী

সন ১৩১৩, ২৪ পৌষ।

মামলার শুনানী শুরু হলো। সুশীলার সই-করা এগ্রিমেণ্টটাই মোক্ষম অস্ত্র। সাক্ষ্য দিতে উঠে মনমোহন পাঁড়ে বললেন, নটগুরু গিরিশ ঘোষের শিক্ষায় সুশীলার সুনাম ক্রমশ বাড়তে থাকে। তার মধ্যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখে মনমোহন তাকে তিনবছরের চুক্তিপত্রে বেঁধেছিলেন। সুশীলার হঠকারিতায় রানা প্রতাপ নাটক খুলতে না-পারার জন্যে মিনার্ভার প্রচুর লোকসান হয়েছে। আরও একটা নাটক দলিত ফণীর মহলা চলছিল। সে-নাটকেও সুশীলার একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। সেটা খুলতে না-পারার জন্যেও মিনার্ভার প্রভূত ক্ষতি হবে। তাছাড়া, গুরুপ্রসাদ সিং নামে একজনের সঙ্গে চুক্তিতে মনমোহন পাঁড়ে কয়েকটি বিশেষ অভিনয় রজনীর আয়োজন করেছেন। সব ক'টি নাটকেই সুশীলার মুখ্য চরিত্র। সেইসব অভিনয়সূচিও বাধ্য হয়ে বাতিল করতে হয়েছে। এইসব ক্ষতির একটা হিসাব কষে মিনার্ভা থিয়েটার দশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের দাবী এনেছে। মনমোহনের আরও অভিযোগ, কারও প্ররোচনায় নির্মীয়মান কোহিনুর থিয়েটারে সম্ভবত সুশীলা যোগ দিতে চলেছে।

আদালতে হাজির হয়ে সুশীলাবালা বললে, আমি কোহিনুর থিয়েটারে যোগ দেওয়ার কথা কোনোদিন ভাবিনি। আমি মনমোহনবাবুকে মিনার্ভা থিয়েটার ছাড়ার ব্যাপারে মৌখিক নোটিশ দিয়েছিলাম। সেটি অগ্রাহ্য করে আমাকে বিপদে ফেলার জন্যে তিনি আমার মুখ্য ভূমিকা উল্লেখ করে রানা প্রতাপ নাটকের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। দলিত ফণী নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে মনমোহনবাবু যেসব খরচের কথা বলেছেন তা মিথ্যা। কারণ, মাত্র একদিনই সে-নাটকের মহলা হয়েছিল। শুধু একথা বলেই সুশীলা ক্ষান্ত হয়নি। মিনার্ভার অংশীদার মহেন্দ্রকুমার মিত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সে এক নগ্ন কুৎসিত অভিযোগ এনেছিল। সুশীলা বলেছিল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারও তার থিয়েটার ছাড়ার একটা কারণ। মহেন্দ্রকুমার মিত্র দিনের পর দিন তার কাছে অশোভন কুপ্রস্তাব নিয়ে হাজির

হতেন। থিয়েটারের একদা অভিনেত্রী সুধীরাবালার সঙ্গে মহেন্দ্র মিত্রের অবৈধ সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এসব কথা সুশীলাবালা সুধীরাকে বলেছে। এইসব অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে সে মিনার্ভা থিয়েটার ছাড়ার মনস্থ করেছে। তার স্বাস্থ্যের অবনতিও একটা বড়ো কারণ।

আদালত সুশীলাবালার এসব অভিযোগের কোনো মূল্য দেয়নি। বরং তার বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অপরাধই প্রমাণ হলো। উনিশ শ' আট সালের সতেরো ফেব্রুয়ারি বিচারপতি ফ্লেচার এই মামলার রায় দিলেন। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুশীলাকে মিনার্ভায় থাকতে হবে। মামলার খরচ মনমোহনকে দিতে হবে। এই রায়ের বিরুদ্ধে সুশীলাবালা আপীল করেছিল। কিন্তু তাতে শুধু খরচই বাড়ল। প্রধান বিচারপতি ম্যাকলীন এবং বিচারপতি হ্যারিংটন আপীলটা খারিজ করে দিলেন। মাথা নিচু করে সুশীলাকে মিনার্ভায় ফিরে আসতে হলো।

উনিশ শ' সাত সালে আবার ফিরে আসি। জগতের নিয়মে এক যায় আর অন্য আসে। ক্লাসিক থিয়েটারের বন্ধ দরজা আবার খুলে গেল। আটষট্টি নম্বর বিডন স্ট্রিটের সেই ঐতিহাসিক বাড়িটায় আবার আলো জ্বলে উঠল। থিয়েটার খুললেন এক নবাগত প্রযোজক। নাম শরৎকুমার রায়। শরতের বাবা প্রসন্নচন্দ্র রায় ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল। থিয়েটারের নাম দেওয়া হলো কোহিনুর। ব্যবসাসূত্রে শরৎকুমার রায় মনমোহন পাঁড়ের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। কাজের অবসরে প্রায়-দিনই তিনি মিনার্ভায় নাটক দেখতেন এবং থিয়ে-টারের কুশীলবদের সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটাতেন। ক্রমে তিনি থিয়েটারে আসক্ত হলেন এবং মিনার্ভার সাফল্য দেখে থিয়েটার খোলায় প্রলুব্ধ হলেন। কোহিনুর থিয়েটার খুলতে সে-যুগে তাঁর খরচ হয়েছিল এক লক্ষ সাত হাজার টাকা। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে স্টার থেকে ভাঙিয়ে আনা হলো। রাতারাতি তিনি লিখলেন চাঁদবিবি নাটক। প্রথম অভিনয় রজনীতেই কোহিনুর চমক লাগিয়ে দিল। ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল চারিদিকে। নামভূমিকায় তারাসুন্দরী, আদিল শাহ দানীবাবু, মল্লজী অপরেশ মুখোপাধ্যায় ও প্রধান স্ত্রী চরিত্রে কিরণবালা ও তিনকড়ি।

সে-যুগে পেশাদারী থিয়েটারগুলোতে রেষারেষির অন্ত ছিল না। টাকার প্রতিযোগিতায় মালিকদের মধ্যে অহমিকা প্রকাশের একটা ভাব দেখা যেত। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও টাকার লোভে এক মঞ্চ থেকে আর এক মঞ্চে চলে যেত।

আজকের দিনে ফুটবল খেলোয়াড়দের মতো তাদের দলবদল লেগেই থাকত। যাই হোক, কোহিনূরের সাফল্যে শরৎকুমার রায়ের সঙ্গে মনমোহন পাঁড়ের বন্ধুত্বে ফাটল ধরল। তাতে শরতের কিছু যায়-আসে না। তিনি তখন রীতিমত থিয়েটার পাগল। আরও চমক লাগাতে চান। মনে মনে ভাবলেন, গিরিশ ঘোষকে না আনতে পারলে জাতে ওঠা যাচ্ছে না। একদিন তিনি সোজাসুজি গিরিশ ঘোষকে বললেন, আপনি যদি দয়া করে আমার থিয়েটারে আসেন বড়ো খুশি হব। গিরিশ হাসতে হাসতে বললেন, আমাকে নিতে হলে নগদ দশ হাজার টাকা সেলামী ও মাসে চার শ' টাকা মাইনে দিতে হবে। শরৎ একটু ভাবলেন। টাকার অঙ্কটা সত্যিই বড়ো। থিয়েটার চালু করতে এক লাখেরও বেশি খরচ হয়ে গেছে। তবুও গিরিশ ঘোষের প্রস্তাবে তিনি রাজি হলেন। গিরিশ কোহিনূরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন। সেইদিনই শরৎ রায় তাঁকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। বাকি পাঁচ হাজারের জন্যে ক'দিনের সময় চাইলেন। সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর গিরিশ ঘোষ বাকি পাঁচ হাজার টাকা চাইলেন। কিন্তু শরতের কাছে টাকা না থাকায় তিনি মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের ওপর পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক দিলেন এবং গিরিশকে অনুরোধ করলেন কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর সেটি যেন ভাঙানো হয়, কারণ ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা নেই। গিরিশ ঘোষ অবশ্য তাতেই রাজি হলেন।

গিরিশ ঘোষের হাতে তখন নতুন নাটক নেই। তাঁর পুরনো পালা ছত্রপতি শিবাজী মঞ্চস্থ হলো। অমর দত্ত তখন কোহিনূরে যোগ দিয়েছেন এবং সে-নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করছেন। পরিচালনা ও আওরঙজেবের ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং নটগুরু। শিবাজী দানীবাবু, লক্ষ্মীবাঈ তারাসুন্দরী ও জিজাবাঈ তিনকড়ি। একযোগে চাঁদবিবি নাটকও চলতে লাগল। কোহিনূর থিয়েটার জমজমাট।

কিন্তু এত সৌভাগ্য এত সুখ শরৎকুমারের বেশিদিন সহ্য হলো না। থিয়েটার খোলার অল্পদিন পরেই নানা রোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। অসুখের উপশম না হওয়ায় ডাক্তাররা হাওয়া বদলের পরামর্শ দিলেন। কলকাতার বাইরে পশ্চিমে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। কিন্তু অবস্থার কোনোই উন্নতি হলো না। ডিসেম্বরের শেষে শরৎ রায় অকালে মারা গেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বত্রিশ। মৃত্যুর কিছু-দিন আগে তিনি উইল করেছিলেন। তাঁর ভাই শিশিরকুমার রায়কে তিনি উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করেন। সেই অধিকারে শিশির কোহিনূর থিয়েটারের ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে নিলেন। থিয়েটারের তখন টালমাটাল অবস্থা। সব-চেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়লেন গিরিশ ঘোষ। কাগজে-কলমে তিনি থিয়েটারের

পরিচালক। শরতের মৃত্যুতে চারিদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা। এই অবস্থায় শিশির-কুমার রায়কে গিরিশ ঘোষ একখানি চিঠি পাঠালেন :

মান্যবর শ্রীযুক্ত শিশির কুমার রায় মহাশয় সমীপেষু—

শুনিতেছি, স্বর্গীয় শরৎবাবু মহাশয়কে Executor করিয়াছেন, অতএব আমার নিবেদন এই যে আমি কোহিনুর থিয়েটারের ম্যানেজার নাম দিয়া Performance advertise করিয়া আসিতেছি। বোধ হয় মহাশয় জানেন, স্বর্গীয় শরৎবাবুর নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, যদিচ টাকাকড়ির সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নাই, আমি Performance advertise করিতাম এবং শয্যাশায়ী হইয়াও পূজনীয় কর্তা মহাশয়ের উৎসাহে থিয়েটারের কার্য যেরূপ তত্ত্বাবধান করিতেছিলাম সেইরূপ করিয়া আসিতেছি। অদ্য হ্যাণ্ডবিলে দেখিতে পাই যে আমার নামে যেরূপ Play advertise হইতেছিল সেইরূপই advertise হইয়াছে। মহাশয়ের নিকট আমি বিনয়পূর্বক জানিতে ইচ্ছা করি যে যেরূপ কার্য করিতেছিলাম সেরূপ কার্য করিব কিনা। এবং যদি যেরূপ করিতেছিলাম করিতে হয়, তাহা হইলে মহাশয়ের নিকট একখানি ক্ষমতাপত্র প্রার্থনা করি। মহাশয় যখন Executor, মহাশয়ের অনুমতি ব্যতীত কোন কার্যে অগ্রসর হইতে পারিব না। অদ্য ও কল্য যেরূপ Performance advertise হইয়াছে তাহা যদি মহাশয়ের অভিপ্রেত হয় উত্তম ; আমি নিশ্চিন্ত হইয়া কার্য করিব। পত্রের উত্তর নিতান্ত প্রার্থনীয়। কারণ সমস্ত actor ও actress প্রভৃতি আমার মুখাপেক্ষি হইয়া রহিয়াছে। ইতি ৩১শে ডিসেম্বর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ।

বিনয়াবনত

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ

শিশিরকুমার রায় এ-চিঠির কোনো জবাব দিলেন না। গিরিশবাবুর সঙ্গে দেখাও করলেন না। ওদিকে থিয়েটারের অবস্থাও খুব খারাপ। মাইনে বাকি পড়ায় শিল্পীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছে। গিরিশ ঘোষ তাদের সামাল দিতে পারছেন না। এমন সময়ে গিরিশ শিশিরকুমার রায়কে আর একখানা চিঠি লিখলেন :

পূজনীয় কর্ত্তামহাশয়ের স্বর্গলাভের জন্য অতিশয় দুঃখিত। এ সময়ে বিষয় কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিতাম না। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে। বিগত ৩১ শে ডিসেম্বর আপনাকে যে পত্র লিখি তাহার মূল কথা এই যে শরৎবাবুর স্বর্গলাভের পর কোহিনুর থিয়েটারে আমি কার কার্য করিব ? যদিচ

মহাশয় আমার বাটীতে আসিয়া শরৎবাবুর Executor স্বরূপ আমাকে কার্য করিতে বলেন, কিন্তু লিখিত কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হই নাই। এক্ষণে কোহিনুরের actorরা আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে আমরা কাহার কার্য করিব ? এবং আমাদের বেতন ও বাকী পাওনা কাহার নিকট পাইব ? আমি যখন শরৎবাবুর জীবিতাবস্থা হইতে অদ্যাবধি টাকাকড়ির কোন সংস্পর্শে আসি নাই ও সেলের টাকা আমার কাছে রাখিবার ক্ষমতা নাই, তখন এ বিষয়ে actorদের কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। সেইজন্য মহাশয়ের নিকট নিবেদন যে, এ সমস্ত মীমাংসা কল্য প্রাতে অতি আবশ্যক, নচেৎ আগামী শনিবার অভিনয় কার্যে নিশ্চিৎ ব্যাঘাত পড়িবে এবং সে নিমিত্ত তাহার দায়িত্ব আমি লইতে পারিব না।

এ বিষয়ে সম্যক মীমাংসা না হইয়া প্ল্যাকার্ড বা হ্যাণ্ডবিল আমার ম্যানেজার নাম দিয়া বাহির হইলে আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিতে বাধ্য হইব যে কোহিনুরের ম্যানেজার থাকিবার আমার আর অধিকার নাই। কারণ আমি স্বর্গীয় শরৎবাবুর কাজ করিতাম, এক্ষণে আমি লিখিত কার্যভার শরৎবাবুর স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রাপ্ত হই নাই। আর আমার নিজ সম্বন্ধে নিবেদন এই যে, শরৎবাবুর নিকট আমার যে বক্রী প্রাপ্য আছে তাহাও মহাশয় আসিয়া মীমাংসা করিবেন। পরিশেষে আমার পুনঃ পুনঃ নিবেদন যে, এ সম্বন্ধে উপেক্ষা করিয়া কল্য প্রাতে স্থির না করিলে তৈয়ারী থিয়েটার নষ্ট হইবে এবং তাহা পুনর্জ্জীবিত করা নিতান্ত সহজ হইবে না। ইতি ২ জানুয়ারী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ।

বিনয়াবনত

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ

গিরিশ ঘোষের কাছ থেকে এই চিঠি পাওয়ার পরদিন শিশিরকুমার রায় একটি সংক্ষিপ্ত পত্রে বললেন :

মান্যবর গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মান্যবরেষু

মহাশয়, আমার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎ কুমার রায় মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় আমি তাঁহার ত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির একজিকিউটর নিযুক্ত হইয়াছি। এক্ষণে কোহিনুর থিয়েটারে আপনি ম্যানেজারীপদে নিযুক্ত থাকিয়া সমুদয় কার্য করিবেন। যাবতীয় অ্যাকটর অ্যাকট্রেস প্রভৃতির বেতন আমি দিতে দায়ী রহিলাম। নিবেদন ইতি—

শিশির কুমার রায়

২২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট

কোহিনুরের সব দায়দায়িত্ব হাতে নিয়ে শিশির রায় হিমসিম খেয়ে গেলেন। ক্রমশই দেনার জালে তিনি জড়িয়ে পড়লেন। গিরিশ ঘোষ বার বার তাগাদা দিয়েও পাওনা টাকা পেলেন না। নিরুপায় হয়ে তিনি হাইকোর্টে মামলা রুজু করলেন। তাঁর পাওনা চার হাজার আট শ' টাকা। আদালতে মামলা উঠল। শিশিরকুমার রায় গিরিশ ঘোষের নামে পাল্টা অভিযোগ আনলেন। থিয়েটারের দুরবস্থার জন্যে তিনি গিরিশকেই দায়ী করলেন। তিনি বললেন, কোহিনুরের পরিচালন ব্যবস্থা হাতে নেওয়ার পর গিরিশ বরাবরই কাজে অবহেলা করেছেন। শরৎকুমার রায় অনেক আশা নিয়ে থিয়েটার শুরু করেছিলেন। ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্যে গিরিশ ঘোষকে নিয়ে এসেছিলেন। গিরিশ ঘোষ যথাযথ দায়িত্ব পালন করেননি এবং শরীর খারাপের অজুহাতে প্রায়ই অনুপস্থিত হতেন। সেই কারণে থিয়েটারে প্রচুর লোকসান হয়েছে। তাছাড়া চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গিরিশ কোহিনুরের জন্যে একটিও নতুন নাটক লেখেননি। এছাড়া অভিনেতা-অভিনেত্রী-দের শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি চরম অবহেলা করেছেন।

বিচারপতি স্টিফেনের এজলাসে মামলার শুনানী শুরু হলো। শিশির রায়ের অভিযোগের সমর্থনে নটগুরু গিরিশ ঘোষের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো সাহস সেদিন কারও ছিল না। গিরিশকে সমর্থন করে দানীবাবু সাক্ষ্য দিলেন। গিরিশ জয়ী হলেন। সেই সময়ে আরও একজন পাওনাদার শিশির রায়ের নামে মামলা করেছিলেন। তাঁর নাম মুরলীধর রায়। তিনিও বিনা বাধায় অনাদায়ী টাকার ডিক্রি পেলেন। শিশির রায় তখন কর্মচারীদের হাতে থিয়েটার দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই অবস্থায় শিশিরের গ্রেপ্তার ও হাজতবাসের প্রার্থনা জানিয়ে গিরিশ ঘোষ কোর্টে আবেদন পেশ করলেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হওয়ার কয়েকদিন পরে শিশির হাইকোর্টে এসে আত্মসমর্পন করলেন। মামলার খরচ সমেত গিরিশ ঘোষের পাওনা তখন পাঁচ হাজার দু' শ'। শিশির কুমার হাই-কোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে নগদ দু' হাজার জমা দিলেন। বাকি তিন হাজার দু' শ' টাকার জন্যে তাঁর এ্যাটর্নি জামিন দাঁড়ালেন। শিশির আপীল করলেন। বিচার-পতি জেনকিন্স ও উডরফ তাঁর আপীল খারিজ করে দিলেন। গিরিশ ঘোষ তাঁর টাকা আদায় করে নিলেন।

নতুন উদ্যমে শিশিরকুমার রায় থিয়েটারে মন দিলেন। তিনি চাইছিলেন দাদা শরতের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু কোহিনুর তখন তার পূর্বগৌরব হারিয়েছে। মামলার সময়ে গিরিশ ঘোষ আবার মিনার্ভায় ফিরে গিয়েছিলেন।

দানীবাবুও বাবাকে অনুসরণ করেছিলেন। সুখের কথা, অর্ধেন্দুশেখর তখন কোহিনূরে ফিরে এসেছিলেন। এসেছিলেন চুনীলাল দেব। আর, সেদিন সেই ভাঙা নৌকার হাল ধরেছিলেন অপরেশ মুখোপাধ্যায়। সেই সময়ে থিয়েটারের দুনিয়ায় অপরেশ ও তারাসুন্দরীকে জড়িয়ে নানা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। তারাসুন্দরীর দুর্নিবার আকর্ষণ কিছুতেই তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ঘরে যুবতী স্ত্রী শিখরবাসিনী। বাগবাজারের বনেদি গাঙ্গুলী পরিবারের মেয়ে। তার কথা ভুলতে বসেছেন অপরেশ। নিজেকে তারাসুন্দরীর সঙ্গে দাম্পত্য বন্ধনে যুক্ত করলেন অপরেশ। তারাসুন্দরী মা হলেন। ছেলের নাম রাখলেন নির্মল। ওদিকে শিখরবাসিনী অপরেশকে একটি কন্যাসন্তান উপহার দিলেন। নাম রাখা হলো মমতা।

কোহিনূর থিয়েটার কোনোরকমে চলতে লাগল। শিশিরকুমার রায়ের বড়ো ভরসা তখন অর্ধেন্দু মুস্তাফী। সেই নটশেখর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উনিশ শ' আট সালের পনেরো সেপ্টেম্বর সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম স্রষ্টা অপরাজেয় রূপদক্ষ নট ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন। নাট্যজগতে নেমে এল এক গভীর শূন্যতা। অর্ধেন্দু থিয়েটারে এসেছিলেন সেকালের কলকাতার এক অভিজাত পরিবার থেকে। তাঁর শিল্প সাহিত্য ও নাট্যকলার প্রেরণা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। অল্প বয়সে অর্ধেন্দু পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন ঠনঠনিয়ার তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ের সঙ্গে। তাঁর দুই ছেলে ব্যোমকেশ ও ভুবনেশ এবং এক মেয়ে তত্ত্বময়ী। সাহিত্য-জগতে ব্যোমকেশ মুস্তাফী সুপরিচিত হয়েছিলেন গবেষক হিসাবে। ভুবনেশও নাট্য ও সংগীতে যশের অধিকারী হয়েছিলেন। তত্ত্বময়ীর বিয়ে হয়েছিল হাইকোর্টের উকিল জোড়াসাঁকোর অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অর্ধেন্দু শুধুমাত্র সার্থক অভিনেতা ছিলেন না, ছিলেন সফল ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রয়াণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সে এক স্মরণীয় সমাবেশ।

সেকালের রঙ্গালয়ের ইতিহাসের অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাজমান অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। নিজের হাতে গড়া ক্লাসিক থিয়েটার চলে যাওয়ার পর কিছুতেই তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। সে-সময়টা তাঁর আত্মবিলাপের কাল। ভাইদের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে পৈত্রিক সম্পত্তির প্রায় সবটাই তিনি নষ্ট করে ফেলেছেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে বিবাহিত হয়ে একটি পুত্রসন্তানের জনক। স্ত্রী হেমনলিনীর প্রতি চরম অবহেলা করেছেন। প্রচণ্ড মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। তবু তাঁকে বাঁচিয়ে

রেখেছিল থিয়েটার। তাঁর কোথাও ভালো লাগছিল না। নিজের থিয়েটারে যে স্বাধীনতা আর সাচ্ছন্দ্য নিয়ে কাজকরেছেন সেটা অন্য থিয়েটারে আশা করা বৃথা। তবু তিনি প্রাণ ঢেলে অভিনয় করে চলেছিলেন। একসময়ে অমর দত্ত বেঙ্গল থিয়েটারের পরিত্যক্ত মঞ্চটা ভাড়া নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ডালিয়া গল্পটিতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জীবনে মরণে নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। সেই সঙ্গে আহা মরি নামে একটা প্রহসনও লিখে ফেললেন। পরে সেখানে মঞ্চস্থ করেছিলেন গিরিশ ঘোষের বলিদান ও মণিলাল বন্দোপাধ্যায়ের বাজিরাও। অমরেন্দ্রনাথের এই নতুন প্রচেষ্টায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মনোমোহন গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নীহার-বালা, বসন্তকুমারী, সুশীলাবালা ও চারুবালা। কিন্তু অমর দত্তর সেই নতুন প্রয়াস বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

আবার ফিরে আসি কোহিনুর থিয়েটারে। দুর্বল শিল্পীদের নিয়ে ভাঙা হাটে অভিনয় আর বিশেষ জমল না। অপরেশ মুখোপাধ্যায় তখন কোহিনুর ছেড়ে দিয়ে তারাসুন্দরীকে নিয়ে একটা ভ্রাম্যমান থিয়েটার খুলে নানা জায়গায় অভিনয় করে বেড়াচ্ছেন। তাছাড়া নটশেখর অর্ধেন্দু মুস্তাফীও পরপারে চলে গেছেন। কোহিনুরের জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমতে শুরু করল। নাট্যশিক্ষক হিসাবে চুনীলাল দেব এলেন। অতুলকৃষ্ণকে দিয়ে নতুন গীতিনাট্য লেখানো হলো। কিন্তু তাতেও কোহিনুর বাঁচল না। অতুলকৃষ্ণের সেই গীতিনাট্য জেনোরিয়া-ই বোধহয় তাঁর শেষ রচনা। উনিশ শ' এগারো সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলা রঙ্গালয়ের অতুলনীয় গীতিনাট্য রচয়িতা অতুলকৃষ্ণ মিত্র পরলোক গমন করেন। শিশিরকুমার রায়ের গ্রহ তখন প্রতিকূল। দেনায় তাঁর চুল বিকিয়ে গেছে। সেই দুর্দিনে চরম আঘাত এল বড়ো ভাই শরৎকুমার রায়ের বিধবা স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর কাছ থেকে। মৃণালিনী শিশিরের নামে হাইকোর্টে মামলা করলেন। শিশিরের আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি তখন উঠেছেন তাঁর ভায়ের কাছে হুগলি জেলার বালটিকড়ি গ্রামে। মৃণালিনী নিঃসন্তান। শরৎকুমার রায় যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে শরৎকুমার রায় একটা অদ্ভুত ধরনের উইল করেছিলেন। তাঁর সমুদয় সম্পত্তি তিনি দুই ভাই শিশিরকুমার, বসন্তকুমার ও মৃণালিনীকে তুল্য অংশে দিয়ে গিয়েছিলেন। উইলে একটা শর্ত ছিল যে, মৃণালিনী যদি সৎভাবে এবং শুদ্ধাচারে বিধবার জীবন যাপন করেন তবেই তিনি

সম্পত্তির অধিকার পাবেন। স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে এহেন ইঙ্গিত শরৎ রায় কেন করেছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। যাই হোক, স্বামীর উইল অনুযায়ী মৃণালিনী সম্পত্তির তিনভাগের এক ভাগ দাবী করলেন। মামলা রুজু হয়েছিল উনিশ শ' এগারো সালের চোদ্দ ডিসেম্বর। মৃণালিনীর আরও অভিযোগ, স্বামীর মৃত্যুর পর শিশির তাকে চরম অবহেলা করতে থাকেন। খাওয়া-পরার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন উদাসীন। অত্যাচার ও অবহেলা সহ্য করতে না-পেরে মৃণালিনী তাঁর দেওরের আশ্রয় বাইশ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট ছেড়ে ভাইয়ের কাছে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর অল্পদিন পরে তাঁর শ্বশুর প্রসন্নকুমার রায়ও মারা যান। নদীয়া জেলার চণ্ডীপুরে বৃহৎ পারিবারিক বাড়ি তখনও যৌথ মালিকানায়। কোহিনুর থিয়েটার শরৎকুমার রায়ের নিজস্ব সম্পত্তি। এক লাখ আট হাজার টাকায় তিনি থিয়েটার কিনেছিলেন। থিয়েটারের উন্নতির জন্যে আরও চল্লিশ হাজার টাকা তিনি খরচ করেছিলেন। সেই থিয়েটার শিশির বাঁধা দিয়েছেন। নাথের বাগানে শরতের একটা আড়তদারি ব্যবসা ছিল। সেটি শিশির ছোটো ভাই বসন্তকে হস্তান্তরিত করেছেন। সম্প্রতি মৃণালিনী জানতে পেরেছেন হাওড়ায় তাঁর স্বামীর একটি ইটখোলা ছিল। তার বর্তমান অবস্থা মৃণালিনীর অজানা। উপরোক্ত এইসব তথ্য মামলার প্রয়োজনে মৃণালিনী তাঁর ভাইকে দিয়ে জোগাড় করেছিলেন।

মৃণালিনীর মামলার সমন পেয়ে শিরিশকুমার রায় বেকায়দায় পড়ে গেলেন। ছুটলেন অ্যাটর্নির কাছে। মৃণালিনীর অভিযোগের জবাব দিলেন তিনি। বললেন, এ-মামলা চলতেই পারে না। কারণ মৃণালিনী গৃহত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়ে অসৎ জীবনযাপন করছে। দাদার স্মৃতিবিজড়িত থিয়েটার চালাতে তিনি নিজে দু' লক্ষ টাকা ঢেলেছেন। দাদার আড়তদারি ব্যবসা তিনি ছোটো ভাইকে দেননি। লোকসানে চলছিল বলে সেটা তিনি বেচে দিয়েছেন। আর, হাওড়ার ইটখোলার মালিক শিশির নিজে। তাতে শরৎকুমারের কোনো অংশ নেই।

যথাসময়ে শিশিরকুমার রায়ের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচার শুরু হলো। এই মামলার শুনানীর সময়ে মৃণালিনীর অসহায় অবস্থার কথা ভেবে বিচারপতির মনে সহানুভূতি জেগেছিল। বিচারপতির সামনে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন মৃণালিনীর বাঁচার প্রশ্ন। শিশিরের ওপর তিনি অন্তর্বর্তী আদেশ দিলেন, মামলা নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত মৃণালিনীর ভরণ পোষণের জন্যে মাসে এক শ' টাকা দিতে হবে। মৃণালিনীর নিযুক্ত কোনো প্রতিনিধি প্রতি মাসে শিশিরের কাছ থেকে টাকা আনবে।

সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশও হলো, কোনো একটি মাসিক কিস্তি না দিলে শিশিরকে জেলে পাঠানো হবে।

দু' মাস পর এই মামলার চূড়ান্ত শুনানী শুরু হলো। থিয়েটারের অন্তঃপুরের রসাল কাহিনী শুনতে আদালত জনতায় ভরে গেলো। জজ সাহেব তাকিয়ে দেখলেন মৃণালিনীকে। সুশ্রী যুবতী। তার মুখে-চোখে যেন প্রতিবাদের ঝড়। শিশির তাকে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়েছে। মৃণালিনী অনড় অটল। এর বিহিত করতেই হবে। প্রকাশ্য আদালতে তার চরিত্রহনন সে কিছুতেই সহ্য করবে না। শিশিরকে সব অভিযোগ প্রমাণ করার জন্যে বিচারপতির কাছে আবেদন জানালেন মৃণালিনী। সব শুনে বিচারক শিশিরকে পাঁচ দিনের সময় দিলেন। সেই সময়ের মধ্যে তাঁকে আদালতে হলফনামা দাখিল করে বলতে হবে কবে ও কোথায় মৃণালিনী কার সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছেন। যদি একাধিক লোকের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক ঘটে থাকে তাহলে তাদের নাম-ধামও আদালতকে জানাতে হবে। তাছাড়া থিয়েটারে টিকিট বিক্রির হিসেব আদালতে দাখিল করতে হবে।

পাঁচদিন কেটে গেল। বৌদির সম্পর্কে শিশির যেসব কু-মন্তব্য করেছিলেন তার সমর্থনে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে পারলেন না। দু'টো মাস যাওয়ার পর তিনি মৃণালিনীর মাসোহারা বন্ধ করে দিলেন। থিয়েটারের টিকিট বিক্রির টাকার হিসেব দেওয়া দূরে থাকুক মৃণালিনীর প্রতিনিধির সঙ্গে কোনোরকমই সহ-যোগিতা করলেন না। তখন বাধ্য হয়ে মৃণালিনী আদালত অবমাননার দায়ে শিশিরকুমারের হাজতবাসের প্রার্থনা জানালেন। চরম বিপাকে পড়লেন শিশির রায়। জল এতদূর গড়াবে তিনি ভাবতে পারেননি। তখন ওই অভিশপ্ত থিয়েটার-বাড়িটা ছাড়া নগদ টাকাপয়সা তাঁর কিছুই নেই। তিনি বুঝতে পারলেন একটা আপস-রফা ছাড়া তাঁর বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। মৃণালিনীর কাছে তিনি আত্ম-সমর্পণ করলেন। দোষ স্বীকার করে নিলেন তিনি। বললেন, তিনি সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। শিশিরকে মৃণালিনী ক্ষমা করেছিলেন। তাঁর নিঃসন্তান একক জীবনে টাকার প্রশ্নটা বড়ো ছিল না। বড়ো ছিল সম্মান আর সম্ভ্রমের প্রশ্ন। যা তিনি চেয়েছিলেন তা হলো ন্যায়নীতি ও মনুষ্যত্ব। আর চেয়েছিলেন মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে। মর্যাদার আঘাতই তাঁকে টেনে এনেছিল বিচারের বেদিতে। শিশিরের আত্মসমর্পণেই সে-বিচার শেষ হয়ে গেছে। মৃণালিনী শিশিরকে ক্ষমা করলেন। দু'পক্ষের সম্মতিতে মামলাটা মিটে গেলো। উনিশ শ' বারো সালের ছয় জুন। বিচারপতি আর্নেস্ট এডওয়ার্ড ফ্লেচারের কাছে সোলেনামা দাখিল হলো।

শিশির তার বৌদির বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতার সব অভিযোগ তুলে নিলেন। মামলার খরচ বাবদ মৃণালিনী পেলেন মাত্র দেড়হাজার টাকা। কিছুদিন পরে শিশিরের সবচেয়ে বড়ো পাওনাদার মুরলীধর রায়ের ডিক্রির টাকা আদায়ের জন্যে কোহিনুর থিয়েটার নীলামে উঠল। মনমোহন পাঁড়ে থিয়েটার কিনে নিলেন এক লাখ এগারো হাজার টাকায়।

উনিশ শ' বারো সাল। ফেব্রুয়ারি মাসের আট তারিখ। কলকাতার থিয়েটার জগতে ঘটল ইন্দ্রপতন। নটগুরু ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট-নাট্যকার গিরিশ ঘোষের মহাপ্রয়াণ। রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে ওপারের সাধনমঞ্চে চলে গেলেন তিনি। রঙ্গজগৎ তথা কলকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে নেমে এল শোকের ছায়া। বেশ কিছুদিন তিনি হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাঁর নিজের লেখা বলিদান নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় তাঁর শেষ অভিনয়। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষণে অভিনয়ে ও নাটক রচনায় তিনি যে-অবদান রেখে গেলেন তা একটা ইতিহাস। তিনি ছিলেন এক অনন্য প্রতিভা। তাঁর প্রতিভায় ছিল প্রজ্ঞার সঙ্গে প্রণতি। ভক্তির সঙ্গে ভালোবাসা। পতিতকে তিনি ভালোবেসেছেন পতিতপাবনের মতো। পতিতাকে শুদ্ধ করেছেন শুদ্ধির আগুনে। নাট্যজগতে একটা শূন্যতা এনে তিনি চলে গেলেন।

মৃত্যুর আট বছর আগে গিরিশ ঘোষ উইল করেছিলেন। সহোদর ভাই অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, যিনি হাইকোর্টে ওকালতি করতেন, তাঁকে একজিকিউটর নিযুক্ত করেছিলেন। গিরিশের বাবা নীলকমল ঘোষ কিছু বিষয়সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। গিরিশ নিজেও কম উপার্জন করেননি। গিরিশ ঘোষের উইল থেকে জানা যায় একমাত্র ছেলে দানীর জন্যে তাঁর মনোবেদনা প্রকট হয়ে উঠেছিল। উইলের এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন, আমার একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ওরফে দানী। আমি তাকে অবিবাহিত বলে জানি। আমার সম্পত্তি দান করার ব্যাপারে আমি তাকে যোগ্য বিবেচনা করি না। আমি আমার একজিকিউটরকে নির্দেশ দিচ্ছি সে যেন দানীর যথাযোগ্য ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। টাকার অঙ্কের ব্যাপারে একজিকিউটরের বিচারই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। যদি দানী পূর্ণ সামাজিক প্রথায় হিন্দু মতে বিয়ে করে তাহলে একজিকিউটর ১৩ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তার সপরিবারে বসবাসের ব্যবস্থা করবে। অতুলকৃষ্ণকে গিরিশ আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি কোনো কারণে বসতবাড়ি বিক্রি হয়ে যায় তাহলে দানীর

কোনো স্থায়ী পাকাবাড়ির ব্যবস্থা যেন করা হয়। বসতবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতাও সেই বাড়িতে স্থানান্তরিত হবেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর বোন দক্ষিণাকালীর জন্যে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে আমৃত্যু বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন। এগারো নম্বর রামকান্ত বসু সেকেণ্ড লেনে গিরিশের আরও একটি বাড়ি ছিল। সেই বাড়ি তিনি তাঁর দুই নাবালক দৌহিত্র দুর্গাপ্রসন্ন ও ভগবতীপ্রসন্নকে দান করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের কপিরাইট তিনি ওদের দিয়েছিলেন। বাকি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তিনি জীবনস্বত্বে অতুলকে দান করেন।

গিরিশ ঘোষের লোকান্তরের তিনমাস পরে মে মাসের বারো তারিখে থিয়েটার-জগতের আকাশ থেকে আরও একটা নক্ষত্র খসে পড়ল। মিনার্ভা থিয়েটারের অংশীদার মনমোহন পাঁড়ের বিশিষ্ট বন্ধু মহেন্দ্রকুমার মিত্র মারা গেলেন। মিনার্ভার সঙ্গে তিনি গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলেন। উনিশ শ' আট সালে দশ বছরের চুক্তিতে অংশীদার হয়েছিলেন। থিয়েটারের উন্নতির জন্যে তিনি বেশ কিছু টাকাও বিনিয়োগ করেছিলেন। থিয়েটার-বাড়ি সম্প্রসারণের পর সেখানে তিনি একটি হোটেলকে ভাড়া দিয়েছিলেন। হোটেল ডি জেন্টিল। যাই হোক, মারা যাওয়ার কিছু আগে মহেন্দ্র মিত্র ও মনমোহন পাঁড়ের বন্ধুত্বে ফাটল ধরে এবং সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যায়। মহেন্দ্রবাবু মনমোহনের কাছে থিয়েটারের হিসাবপত্র বুঝতে চাইলেই অশান্তির সূত্রপাত। উনিশ শ' এগারো সালের ষোল জুন তারিখে যৌথ ব্যবসা ভেঙে গেল। মহেন্দ্র মিত্র আর অংশীদার রইলেন না। থিয়েটারের হিসাবপত্র তৈরি শুরু হলো। তিনি তাঁর পাওনা টাকার জন্যে বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। তাঁর একমাত্র ছেলে শিশিরকুমার মিত্র তখন নাবালক। সেই নাবালকের হয়ে হাইকোর্টে মামলা আনলেন মহেন্দ্র মিত্রের ভাই উপেন্দ্রকুমার মিত্র। আদালতের কাছে তিনি নিবেদন করলেন যে থিয়েটারের লাভের একটা মোটা অঙ্ক এবং বিনিয়োগ করা মোটা টাকা মহেন্দ্র মিত্রের পাওনা ছিল। বার বার অনুরোধসত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবদ্দশায় টাকা আদায় করতে পারেননি।

মনমোহন পাঁড়ে বিপদে পড়লেন। গিরিশ ঘোষ অসুস্থ হওয়ার সময় থেকেই থিয়েটারের দুরবস্থা চলছিল। তিনি মারা যাওয়ার পর অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী থিয়েটার ছেড়ে চলে গেছেন। ভরসা শুধু দানীবাবু। নইলে থিয়েটার বন্ধ হয়ে যেত। সেই দুর্দিনে আদালতের সমন এল। এই মামলায় উপেন্দ্র মিত্রের অন্য অভিযোগ, মনমোহন পাঁড়ে মিনার্ভার কেউ নন। পার্টনারশিপ ভেঙে যাওয়ার

পর মহেন্দ্র মিত্রের কাছে মাসিক দেড় হাজার টাকায় ভাড়া নিয়ে মনমোহন পাঁড়ে থিয়েটার চালাচ্ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মনমোহন জোর করে থিয়েটার অধিকার করেছেন। তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্র আদালতে দাখিল করলেন। মাননীয় বিচারপতিকে অনুরোধ করলেন থিয়েটারের ওপর রিসিভার নিয়োগ করতে। মনমোহন পাঁড়ে দেখলেন রিসিভার বসলে তাঁর কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। সেই সর্বনাশ রুখতে তিনি শর্তে রাজি হলেন। আদালতের নির্দেশে তিনি পাঁচ হাজার টাকা জামানত রাখলেন এবং প্রতিশ্রুত হলেন থিয়েটারের কোনো সম্পত্তি বা আসবাবপত্র নড়চড় হবে না। মহেন্দ্রকুমার মিত্রের মৃত্যুর দিন থেকে এই অন্তর্বর্তী আদেশের দিন পর্যন্ত মাসে সাত শ' টাকা হিসাবে যত টাকা হয় সেই পরিমাণ টাকা তিনি জমা রাখবেন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে। তাছাড়া, মামলা যতদিন চলবে ততদিন প্রতি মাসে সাড়ে সাত শ' টাকার প্রমিসরি নোট তিনি আদালতে জমা দেবেন। মনমোহন পাঁড়ে বেকায়দায় পড়ে সেই শর্তে রাজি হয়েছিলেন।

কয়েকদিন পরে আক্রোশের বশে মনমোহন পাঁড়ে উপেন্দ্র মিত্রের নামে একটা মামলা জুড়ে দিলেন। মহেন্দ্র মিত্রের কাছে তাঁর আট হাজার টাকা পাওনা ছিল। দুটো মামলার শুনানী একই সঙ্গে চলতে লাগল। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত কিছু লোক এবং কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাক্ষ্য নেওয়া হলো। মিনার্ভা থিয়েটারের মামলা কলকাতার নাট্যজগতের একটা স্মরণীয় মামলা। উনিশ শ' পনেরো সালে ব্যারিস্টার এইচ. ডি. বসু আরবিট্রেটর নিযুক্ত হলেন। তাঁর সালিশীর রিপোর্ট সাপেক্ষে তিন বছরের জন্যে উপেন্দ্রকে মিনার্ভার লেসী বলে ঘোষণা করা হলো। মিনার্ভার যাবতীয় সম্পত্তি ও গুডউইল আপাতত তাঁর। মনমোহন পাঁড়েকে তিনি মাসে দেড় হাজার টাকা দেবেন। সেই টাকার জন্যে পাঁচ হাজার টাকার দু'জন জামিনদার দায়াবদ্ধ থাকবেন। আদালত থেকে মনমোহন পাঁড়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা হলো যে মিনার্ভা নাম নিয়ে তিনি কোনো ব্যবসা করতে পারবেন না। যদি তিনি কোনো নাট্যশালা খোলেন তাহলে অন্য নামে খুলতে হবে।

আদালতের ছাড়পত্র নিয়ে উপেন্দ্র মিত্র নিশ্চিন্ত হয়ে মিনার্ভা থিয়েটার চালাতে লাগলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সিংহল বিজয় নাটক খোলা হলো। সঙ্গে নতুন পুরনো আরও অনেক নাটক। নামী-দামী অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনেকেই ফিরে এলেন। ওদিকে দিনের পর দিন মামলার শুনানীও চলতে লাগল। মহেন্দ্রকুমার মিত্রর নাবালক ছেলে শিশিরকুমার মিত্র তখন সাবালক হয়েছে। উনিশ শ' উনিশ

সালের পনেরো মে আরবিট্রেটর এইচ. ডি. বসু অ্যাওয়ার্ড দিলেন। মনমোহন পাঁড়েকে দিতে হবে ন' হাজার তিন শ' ন' টাকা পাঁচ আনা। মামলায় যার যার খরচ তার তার নিজের।

জল এতদূর গড়াবে মনমোহন পাঁড়ে ভাবতে পারেননি। শিশিরকুমার মিত্রের হাতে ছ' হাজার টাকা তুলে দিয়ে তিনি মামলাটা মিটমাট করলেন। এই শিশিরকুমার মিত্র পরবর্তীকালে শিশির মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন। তিনিই মোহন সিরিজের প্রকাশক যা রহস্যকাহিনীর ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেছিল। এই সুবৃহৎ মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল উনিশ শ' উনিশ সালের ছাব্বিশে আগস্ট।

আদালতের আদেশে মনমোহন পাঁড়ের কাছ থেকে থিয়েটারের মালিকানা যেদিন চলে গেল, সেদিন লজ্জায় অপমানে তিনি আত্মমর্যাদায় ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। সে-যুগের কলকাতায় তিনি ছিলেন এক স্বনামধন্য ধনী। টাকা দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন মর্যাদা কিনতে। পারেননি। তবু যা হারিয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ পেলেও তিনি মনোবল হারাননি। ক্ষমতার অহমিকা ছিল তাঁর। সেই অহমিকাকে রূপ দেওয়ার মতো টাকাও তাঁর ছিল। তাই এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের অনেক আগেই কোহিনুর কিনে নিয়ে তিনি নতুন থিয়েটার গড়েছিলেন— যার নাম মনমোহন থিয়েটার।

উনিশ শ' তেরো সালের মে মাস। বিদগ্ধ পণ্ডিত, কবি ও গীতিকার বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সফল নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইহলোক ত্যাগ করলেন। উত্তর কলকাতার খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মেয়ে সুরবালাকে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু স্ত্রীর অকালমৃত্যু তার জীবনটা ছন্দহীন করে গেল। সেকালের ভারতবর্ষ পত্রিকা ছিল তাঁরই পরিকল্পিত। অবশ্য মৃত্যুর আগে তিনি সে-পত্রিকার প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি। অনেকগুলি মঞ্চ-সফল নাটকের রচয়িতা ছিলেন তিনি। সেসব রচনা আজও অম্লান।

সেই বছরেই অমরেন্দ্রনাথ দত্তর স্ত্রী হেমনলিনী মারা গেলেন। অনুতাপ আর অনুশোচনায় ভেঙে পড়লেন অপরাজেয় নট অমর দত্ত। তিনি তখন আত্মদহনে ভুগছিলেন এই কথা ভেবে যে তাঁরই অবহেলায় হেমনলিনী চলে গেলেন। অমর দত্ত ডুবে গেলেন সুরায়। মজে গেলেন অভিনয়ে। মঞ্চকে অবলম্বন করে তিনি শান্ত হতে চাইলেন। তখন তিনি স্টার থিয়েটারের পরিচালক। সে-সময়ে

যেসব নাটক তিনি উপহার দেন তার মধ্যে ছিল মাধবীকঙ্কণ, কপালকুণ্ডলা, চাঁদবিবি, পূর্ণচন্দ্র, দুর্গেশনন্দিনী ও নবীন তপস্বিনী। সব নাটকেই ছিল তাঁর মুখ্য ভূমিকা। নিজের লেখা উপন্যাস অভিনেত্রীর রূপ তিনি নাটকাকারে পরিবেশন করলেন। এই নাটকেই অভিনেত্রী সুশীলাবালার জীবনের শেষ অভিনয়। বাংলা রঙ্গালয় হারালো এক দরদী অভিনেত্রীকে।

অত্যাচারে অমিতাচারে অমর দত্তর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ল। ডাক্তারের পরামর্শে উনিশ শ' চোদ্দ সালের অক্টোবর মাসে তিনি হাওয়া বদলের জন্যে কাশী চলে গেলেন। থিয়েটারের ভার দিয়ে গেলেন চুনীলাল দেবের ওপর। অমর দত্তর অনুপস্থিতিতে চুনীলাল বিশ্বাসভঙ্গ করে চলে গেলেন মনমোহন থিয়েটারে। প্রবাসে অসুস্থ অমরেন্দ্রনাথের কানে সে-খবর গেল। তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে অমর দত্ত কলকাতায় ফিরে এলেন। থিয়েটার তাঁর জীবনের স্বপ্ন। তাঁর প্রাণের চেয়ে বড়ো। অসুস্থ শরীর নিয়ে আবার তিনি দেখা দিলেন রঙ্গমঞ্চে। উনিশ শ' পনেরো সালের পনেরো ডিসেম্বর। স্টার থিয়েটারে তখন ডি. এল. রায়ের সাজাহান নাটক চলছিল। অমর দত্ত আওরঙজেবের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। অভিনয়ের মাঝপথে শুরু হলো রক্ত-বমি। তিনি ফিরে গেলেন গ্রিনরুমে। শুয়ে পড়লেন। সেই তাঁর শেষ মঞ্চাবতরণ। তারপর কিছুদিন রোগভোগ করে উনিশ শ' ষোল সালের জানুয়ারি মাসের ছ' তারিখে জীবনের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে প্রবাদপুরুষ অমর দত্ত চলে গেলেন জীবনের পরপারে। নাট্য-ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করলেন তিনি। বাংলার নাট্যশালাকে অমরেন্দ্রনাথ দিয়ে গেলেন নাট্যভাবনার নতুন আঙ্গিক নতুন চিন্তা-ধারা। ভাবীকালের মানুষের জন্যে রেখে গেলেন এক সুখ-দুঃখের স্মৃতি—যা কোনোদিন মুছে যাবার নয়।

অমর দত্তর মৃত্যুর পর স্টার থিয়েটার লীজ নিলেন অনঙ্গমোহন হালদার। কিছুদিন পরে তিনি বিদায় নিলেন—নতুন লেসী হলেন কলুটোলার গিরিমোহন মল্লিক। শক্ত হাতে হাল ধরার মতো লোক তখন স্টার থিয়েটারে কেউ ছিল না।

মঞ্চের রানী তিনকড়ির শরীর তখন ভাঙতে শুরু করেছে। কোহিনুর থিয়েটার উঠে যাওয়ার পর সাময়িকভাবে সে থিয়েটার থেকে অবসর নিল। স্বাস্থ্য-উদ্ধারের আশায় কাশীধামে গিয়ে সে বিশ্রাম নিল। সেখানে থাকতেও থিয়ে-টারের আকর্ষণ তাকে হাতছানি দিচ্ছিল। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর কলকাতায় ফিরে তিনকড়ি মনমোহন থিয়েটারে যোগ দিল। সেই সময়ে ক্ষেত্রমোহন মিত্র

বেঙ্গল মঞ্চটা ভাড়া নিয়ে থেস্‌পিয়ান টেম্পল নাম দিয়ে থিয়েটার খুললেন। তিনকড়িকে ডেকে নিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে সে বেশিদিন অভিনয় করতে পারল না। শরীর একেবারেই ভেঙে গেল। উনিশ শ' সতেরো সালের তেরো নভেম্বর প্রতিভাময়ী তিনকড়ি মারা গেল। সেই হতভাগিনীর বিয়োগে চোখের জল ফেলার কেউ ছিল না। মাত্র কয়েকমাস আগে তিনকড়ি উইল করেছিল। এককালের রিক্ত নিঃস্ব তিনকড়ি তখন ষোল ও সতেরো নম্বর চন্দ্র সুর লেনে দু'খানা বাড়ির মালিক। গয়না ও আসবাবপত্রও প্রচুর। তিনকড়ির উইল থেকে জানা যায় তার একজন মনের মানুষ ছিলেন। নাম জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনকড়ি তাঁকে তার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করেছিল। দুর্ভাগ্য, তিনকড়ি মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে সেই ভদ্রলোক মারা যান। তখন প্রথম উইল বাতিল করে সে তার দ্বিতীয় ও শেষ উইল করে। সেই উইলে সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অফ বেঙ্গলকে একজিকিউটর নিয়োগ করে। তার একখানি বাড়ি, গহনাপত্র এবং যাবতীয় আসবাব জ্যোতিঃপ্রকাশের ছেলে যামিনীপ্রকাশকে দেওয়ার জন্যে সে নির্দেশ দেয়। অপর একটি বাড়ি একজিকিউটরকে বিক্রি করবার নির্দেশ দেয় সে। বাড়ি বিক্রির টাকা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নগদ টাকা দান করার নির্দেশ দেয়। নটগুরু গিরিশ ঘোষের স্মৃতি তহবিলে এক হাজার, নিজের গুরুদেবের ছেলে যশোদানন্দন গোস্বামী এক হাজার, কুলপুরোহিত দু' শ' পাড়ার ডাক্তার আশুতোষ ঘোষ পাঁচ শ', ধর্মবোন মনোরমা ওরফে মলিনা এক হাজার, নিজের ভৃত্য গোপীর স্ত্রী দেড় শ' রামকৃষ্ণ মিশন তিন হাজার, তারকেশ্বরের মন্দির পাঁচ শ' কলকাতার বোবা-কালা স্কুল পাঁচ শ', পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির আড়াই শ' কালীঘাটের কালীমন্দির আড়াই শ'। তিনকড়ি আরও বলে গিয়েছিল যে বাড়ি বিক্রির টাকা থেকে এই টাকা দান করে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা কলকাতা কুষ্ঠ আশ্রমে দেওয়া হবে ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা হবে। তিনকড়ির উইল থেকে বোঝা যায় তার চরিত্র কত উদার ছিল। দেবদেবীর প্রতি ভক্তি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা তার জীবনের সব ক্লেদ ধুয়ে দিয়েছে। তিনকড়ির দু'খানা বাড়িতে অনেক গরীব ভাড়াটে থাকতো। প্রত্যেক ভাড়াটেকে সে পঞ্চাশ টাকা করে দিয়েছিল। তিনকড়ির এই বিরাট দানের কথা আজকের দিনেও বহু লোকের কাছে অজ্ঞাত। তার চরিত্রের উদারতার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। কলকাতা হাইকোর্টের মহাফেজখানায় সেই অমূল্য দলিল গচ্ছিত আছে।

উপেন মিত্রের মিনার্ভা থিয়েটারে খোলা হলো অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের নাটক রামানুজ। রামানুজের সাফল্য অপরেশকে সফল নাট্যকার হিসাবে চিহ্নিত করল। পরের নাটক উর্বশী। নাচে গানে মিনার্ভাকে মাতিয়ে দিল। মিনার্ভায় দর্শকের ভিড় দেখে মনমোহন পাঁড়ে উঠে-পড়ে লাগলেন। তাঁর বড়ো ভরসা দানীবাবু। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পানিপথ নাটক নামালেন তিনি। বাবর দানী বাবু, হুমায়ুন হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। প্রধান স্ত্রী-চরিত্রে কুসুমকুমারী ও আশ্চর্যময়ী। তার পরের নাটক নিশিকান্ত বসু রায়ের দেবলাদেবী মঞ্চস্থ করে তিনি মিনার্ভাকে দমিয়ে দিলেন। খিজির খাঁর চরিত্রে একা দানীবাবুই শয়ে শয়ে দর্শক টানছিলেন। এই সাফল্যের মাঝেও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দলবদল লেগেই রইল। মনমোহন পাঁড়ে এই সময় একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন। থিয়েটার গড়ার পর মনমোহন চারুশীলাকে নিয়েছিলেন। চল্লিশ টাকা মাইনেতে চারুশীলা পাঁচ বছরের জন্য অভিনয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। হঠাৎ চারুশীলা মনমোহনকে বিপদে ফেলে থিয়েটারে আসা বন্ধ করলেন। মনমোহন আবার হাইকোর্টে ছুটলেন। চারুশীলার সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ তখনও শেষ হয়নি। তার প্রতি সবিশেষ যত্ন নিয়ে বহু সময় ও টাকা খরচ করে অভিনয়ে তার সুনামের পথ খুলে দিয়েছিলেন মনমোহন পাঁড়ে। সমস্ত চলতি নাটকে মনমোহন তার জন্যে বিশিষ্ট ভূমিকা বণ্টন করেছেন। থিয়েটারে আসা বন্ধ করায় মনমোহন তার কাছে হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করলেন। অন্য থিয়েটারে যাতে সে যোগ দিতে না-পারে তার জন্যে তিনি আদালতের কাছে নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করলেন। মনমোহন সোজাসুজি বললেন, মিনার্ভার উপেন মিত্রের প্ররোচনাতেই চারুশীলা এ-কাজ করেছে। আদালতের সমন পেয়ে চারুশীলা রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো বুঝেছিলেন মনমোহন পাঁড়ের সঙ্গে মামলা লড়ার ক্ষমতা তার নেই। বিচারপতি ফ্লেচারের এজলাসে মামলা উঠতে মনমোহন পাঁড়ে সেটি প্রত্যাহার করে নিলেন। ভয়ে হোক, ভুল বুঝে হোক—চারুশীলা মনমোহন থিয়েটারে ফিরে এসেছিলেন মামলা এজলাসে ওঠার আগেই।

কিছুদিন পরে মনমোহন থিয়েটারে আর-একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। উনিশ শ' কুড়ি সালের সেপ্টেম্বরের ছ' তারিখ। মনমোহন থিয়েটারে তখন বিষবৃক্ষ নাটকের অভিনয় চলছে। এমন সময়ে হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ এল এখনি অভিনয় বন্ধ করতে হবে। বিষবৃক্ষ অভিনয়ের ওপর আদালত থেকে ইনজাংশন জারি হয়েছে। পূর্ববর্তী দিনগুলোয় এ-নাটক অভিনীত হওয়ার জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করা

হয়েছে। এই অভাবনীয় ঘটনায় নট-নটীরা ভীত, বিচলিত। মঞ্চের আলো নিভে গেল। দর্শকরা আগেই বিপদ বুঝে সরে পড়েছেন। মনমোহন পাঁড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বিষবৃক্ষের অভিনয়ের আয়োজন করে সত্যিই কি তিনি বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন ?

বিষবৃক্ষ নাটকের অভিনয় বন্ধ করার জন্যে আদালতে আবেদন করেছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মেয়ে শরৎকুমারী দেবী। আঠারো শ' বাহাত্তর সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বিষবৃক্ষ উপন্যাস প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর আগে বঙ্কিম তাঁর সমস্ত রচনাবলী ও সাহিত্যকীর্তি স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। রাজলক্ষ্মী দেবী মৃত্যুর আগে সেসব রচনার স্বত্ব মেয়ে শরৎকুমারীকে দিয়ে যান। শরৎকুমারী কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে জানতে পারেন মনমোহন থিয়েটারে বিষবৃক্ষের অভিনয় চলছে। জুলাই মাসের একত্রিশ তারিখে এবং আগস্ট মাসের সাত, চোদ্দ, একুশ ও আটাশ তারিখে মনমোহন থিয়েটারে এই নাটক অভিনীত হয়েছে। এ-ব্যাপারে মনমোহন পাঁড়ে কোনো অনুমতি নেননি। মামলা আনার আগে মনমোহন পাঁড়ের কাছে তিনি জবাব চেয়েছিলেন, কেন তাঁর অনুমতি ছাড়া এ-নাটকের অভিনয় চলছে। কিন্তু মনমোহন নিরুত্তর ছিলেন। শেষে বাধ্য হয়ে তিনি কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছে। ক্ষতিপূরণ দাবী করেছেন পনেরো হাজার টাকা। অভিনয় বন্ধ হওয়ায় মনমোহন পাঁড়ে বিপদে পড়লেন এবং বেশ ভয়ও পেলেন। মনমোহন ভেবেছিলেন কোনো এক সময়ে শরৎকুমারীর অনুমতি নিয়ে আসবেন। তার আগেই এই মামলা। মাত্র কয়েক রাত্রি অভিনয়ে বিষবৃক্ষ নাটক তাঁকে সাফল্য ও জনপ্রিয়তা দুই-ই দিয়েছিল। তাতে উৎসাহিত হয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল মঞ্চস্থ করার কথা ভাবছিলেন। তার মাঝে হঠাৎ এই অঘটন। যাই হোক, মনমোহন পাঁড়ে বিচক্ষণ ব্যবসায়ী ছিলেন। বিপদের মাঝেও তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন। যেমন করে হোক, যত টাকা লাগে বিষবৃক্ষের অভিনয় তিনি চালু রাখবেন। উপেন মিত্র উপহাস করবেন, এ তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। শরৎকুমারীর সঙ্গে কোনো বিরোধিতা না-করে একটা মীমাংসার পথ খুঁজলেন তিনি। কোর্টে হাজির হয়ে তিনি দোষ স্বীকার করে নিলেন এবং মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন। সুযোগ পেয়ে শরৎকুমারী যতদূর সম্ভব সুবিধা আদায় করে নিলেন। দুজনের সম্মতিতে একটা আপসনামা সই হলো। বিষবৃক্ষ নাটক অভিনয়ের জন্যে প্রতি শনিবার আশি টাকা, রবিবার পঁচিশ টাকা ও অন্যান্য ছুটির

দিন তিরিশ টাকা হিসাবে মনমোহন পাঁড়েকে দিতে হবে। বিনা অনুমতিতে নাটক অভিনয়ের জন্য দু' শ' টাকা খেসারৎ দিতে হবে। এই মামলার সমস্ত খরচ মনমোহনকে বহন করতে হবে। সসম্মানে মামলাটা মিটে গেল। পরের নাটক কৃষ্ণকান্তের উইল মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে শরৎকুমারী মনমোহনকে কথা দিয়েছিলেন। সহজে মামলাটা মিটে যাওয়ায় মনমোহন পাঁড়ের দুশ্চিন্তা দূর হলো। খবরের কাগজে সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত হলো বিষবৃক্ষ নাটকের পুনরাভিনয়ের ঘোষণা।

স্টার থিয়েটারের কথায় ফিরে আসি। কলুটোলার গিরিমোহন মল্লিক লীজ নিয়ে থিয়েটার চালাচ্ছিলেন। গিরিমোহনের সঙ্গে একটা নতুন চুক্তিতে অপরেশ মুখোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরী স্টারে অভিনয় করতে রাজি হলেন। সে সময়েই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের কিন্নরী নাটকের অভিনয়-স্বত্ব নিয়ে স্টারের বিরুদ্ধে মামলা করে মিনার্ভা। আদালতের আদেশে স্টারে কিন্নরীর অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। স্টারে শুরু হলো অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের ছিন্নহার। দু' বছর থিয়েটার চালিয়ে গিরিমোহন মল্লিক লীজ ছেড়ে দিলেন। অমৃতলাল বসু, হরিপ্রসাদ বসু ও দাসুচরণ নিয়োগী তখন বার্ধক্যের সীমায় পৌঁছে গেছেন। সংগঠনের ক্ষমতা হারিয়েছেন তাঁরা। থিয়েটারের হাল ধরার জন্যে চাই সুযোগ্য কর্ণধার। অপরেশ মুখোপাধ্যায় এগিয়ে এলেন। তিনি স্টার থিয়েটারের লেসী হলেন। নতুন নাটক লিখলেন অযোধ্যার বেগম। সে-নাটক রাতারাতি সাড়া জাগাল। পৌঁছে গেল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তারপর অপরেশের সুদামা অভিনীত হলো। আর্থিক দিক থেকে সে-নাটকও সফল হয়েছিল।

এই সময় কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়গুলোতে চরম প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত মনমোহন পাঁড়ে সেই প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছিলেন না। উনিশ শ' কুড়ি সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দুবীর নাটক খোলা হলো। কিন্তু সে-নাটক দর্শকরা নিল না। তারপর ওই একই নাট্যকারের লেখা আলেকজাণ্ডার নাটক নামানো হলো। সেই প্রযোজনাও চরমভাবে ব্যর্থ হলো। তার পরের প্রযোজনা নিশিকান্ত বসুরায়ের ললিতাদিত্য নাটকও দর্শকের মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারল না। মনমোহন পাঁড়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। তাহলে দানীবাবু কী সত্যিই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন? দর্শকদের দেবার পুঁজি কি তাহলে তাঁর শেষ হয়ে গেল? মনমোহনের মনে সেই প্রশ্নটা তখন বড়ো করে দেখা দিয়েছিল। সেই দুঃসময়ে মনমোহন আবার একটা মামলায় জড়িয়ে পড়লেন।

উত্তরবঙ্গে বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্যে তিনি চন্দ্রশেখর নাটক পরিবেশন করবেন ব'লে বিজ্ঞাপন দিলেন। কিন্তু সে-নাটক অভিনয়ের জন্যে কোনো অনুমতি নেননি। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মনমোহন থিয়েটারের বিরুদ্ধে মামলা করে অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। মনমোহন পাঁড়ের অনেক টাকা ক্ষতি হলো।

উনিশ শ' একুশ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। সিনেমা-ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ম্যাডান থিয়েটারের পার্শি মালিকদের মাথায় থিয়েটার খোলার শখ চাপল। তারা আলফ্রেড মঞ্চ ভাড়া নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে আলাদিন ও সতী লীলা পালা পরিবেশন করল। তারপর তারা আরও বড়ো কিছু ভাবতে লাগল। এখনকার উত্তরা ও শ্রী সিনেমার তখন নাম ছিল ক্রাউন ও কর্নওয়ালিশ। কর্নওয়ালিশ স্টেজে ওরা নিবেদন করল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের আলমগীর। নামভূমিকায় শৌখিন অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী। সুরুচিসম্পন্ন সুশিক্ষিত সুদর্শন নট। সে-নাটকে তাঁর সঙ্গে অভিনয়ে ছিলেন কামবক্স তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজসিংহ প্রবোধ বসু, ভীম সিংহ সত্যেন দে এবং উদিপুরী কুসুমকুমারী। পুরানো সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে শিশিরকুমারের নতুন অভিনয়ধারা দেখে দর্শকরা অভিভূত। তারপর চন্দ্রগুপ্ত নাটকে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর চাণক্য এক অনন্য শিল্পকর্ম। কিন্তু কর্নওয়ালিশ মঞ্চে তিনি বেশিদিন থাকতে পারলেন না। তাঁর অল্পদিনের অভিনয়েই থিয়েটার-জগতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। মিনার্ভা, মনমোহন, স্টার সকলে তখন ভাবতে শুরু করল নতুন কিছু দিতে হবে। দিন বদলের পালা আসছে। উপেন্দ্র মিত্র আগেই ভেবেছিলেন এভাবে চললে সামনে দুর্দিন। দুজন তরুণ অভিনেতাকে তিনি নিয়ে এলেন। একজন নরেশচন্দ্র মিত্র—ভবানীপুরের অভিজাত বংশের শিক্ষিত যুবক। অপরজন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সিমলা পাহাড়ে সরকারি চাকরি ছেড়ে মঞ্চের টানে তিনি কলকাতায় চলে এসেছিলেন। মিনার্ভায় চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় রূপ দিলেন নরেশ মিত্র এবং আন্টি-গোনাসের ভূমিকায় রূপ দিলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

উনিশ শ' বাইশ সালে আঠারোই অক্টোবর এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পুড়ে গেল উপেন্দ্র মিত্রের কপাল, তাঁর আশা উদ্যম, স্বপ্ন ও সাধনা। সুন্দরের পূজারী নটনটীদের প্রাণাধিক প্রিয় রঙ্গালয় লেলিহান অগ্নিশিখার সঙ্গে আকাশে বিলীন হয়ে গেল। সেদিনের অগ্নিকাণ্ডে যে বিপুল ক্ষয়-

ক্ষতি হয়েছিল, উপেন্দ্র মিত্রকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার দাম দিতে হয়েছে।

মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে যাওয়ার পর উপেন্দ্র মিত্র আলফ্রেড থিয়েটার ভাড়া নিয়ে মিনার্ভার নামে সেখানে নাটক অভিনয় শুরু করেন। সেখানে নাটক পরিবেশিত হয় মনোমোহন রায়ের লেখা জীবনযুদ্ধ, ডি. এল. রায়ের বঙ্গনারী। এ ছাড়া মিশরকুমারী, প্রেমের তুফান, আলিবাবা, আবুহোসেন প্রভৃতি। আলফ্রেড ছাড়া ভবানীপুরের রসা থিয়েটার ভাড়া নিয়েও মিনার্ভা কিছুদিন অভিনয় চালিয়েছিল।

ম্যাডানদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী নিজের একটা নাট্যদল গড়লেন। ডি. এল. রায়ের দাদা জ্ঞানেন্দ্র রায় নবপ্রভা নামে একটা মাসিকপত্র সম্পাদনা করতেন। তাতে ডি. এল. রায়ের সীতা নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি পড়ে শিশিরকুমার সীতা অভিনয়ে আগ্রহী হন। শিশিরকুমারের দলে তখন যোগ দিয়েছেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ললিতমোহন গোস্বামী, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী ও রবি রায়। মেয়েদের মধ্যে মালিনী, বিরজাসুন্দরী, শেফালিকা, পুতুল ও প্রভা। ইডেন গার্ডেনে ক্যালকাটা একজিবিশনের অস্থায়ী মঞ্চে শিশিরকুমার সীতা নাটক অভিনয় করলেন। সারা শহরে শিশিরকুমারের নাম ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর সাফল্য দেখে স্টার থিয়েটার ঈর্ষান্বিত হলো। সেই সময়ে স্টারে যোগ দিয়েছিলেন এক শক্তিমান তরুণ অভিনেতা। ভবানীপুর কাঁসারী পাড়ার চন্দ্রভূষণ চৌধুরীর ছেলে অহীন্দ্রভূষণ চৌধুরী। আর যোগ দিয়েছিলেন ভবানীপুরের আর-এক দক্ষ নট তিনকড়ি চক্রবর্তী। মিনার্ভা আগুনে পোড়ার পর নরেশ মিত্রও তখন স্টারের নিয়মিত অভিনেতা। অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের নতুন নাটক কর্ণার্জুন শুরু হলো। কর্ণ সেজেছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, অর্জুন অহীন্দ্র চৌধুরী, শকুনি নরেশ মিত্র। প্রধান স্ত্রী-চরিত্রে ছিলেন নিভাননী, মনোরমা ও নীহারবালা। প্রথম রাত্রি থেকেই সে-নাটকের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা। টিকিটের চাহিদা অভাবনীয়। সে-নাটক স্টার থিয়েটারকে প্রচুর পয়সা দিয়েছিল।

ইডেন গার্ডেনে প্রদর্শনীতে অভিনয়ে সাফল্যের পর শিশির ভাদুড়ী আলফ্রেড থিয়েটার ভাড়া নিয়ে সীতা অভিনয়ের আয়োজন করলেন। কিন্তু বাধা এলো স্টার থিয়েটারের কাছ থেকে। স্টার থিয়েটার ডি. এল. রায়ের ছেলে দিলীপকুমার রায়ের কাছ থেকে চুপিচুপি সীতার মঞ্চস্বত্ব কিনে নিয়েছে। ফলে শিশিরকুমারকে বাধ্য হয়ে সীতার অভিনয় বন্ধ করতে হলো। বাধা পেয়েও শিশিরকুমার পেছপা হলেন না। পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে নাটক লেখায় অধিকার সকলের আছে। তিনি রাতারাতি যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে নাটক লিখিয়ে অভিনয় করলেন। যোগেশ

চৌধুরীর সীতাও আলোড়ন তুলল।

উনিশ শ' তেইশ সাল অপরেশচন্দ্রকে যেমন সাফল্যের জয়মাল্য দিয়েছিল তেমনি দিয়েছিল নানা বিপর্যয়ের পসরা। সেই বছরেই এপ্রিল মাসে অপরেশ স্টার থিয়েটার হস্তান্তর করলেন। এই প্রমোদসংস্থার পরিচয় হলো আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড। ডিরেক্টর হলেন অ্যাটর্নি সতীশচন্দ্র সেন, অ্যাটর্নি নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেক্রেটারির পদে বহাল হলেন প্রবোধচন্দ্র গুহ। অপরেশ মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার হিসাবে রয়ে গেলেন। এর কিছুদিন আগে থেকে অপরেশের সঙ্গে তারাসুন্দরীর একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল। ক্রমে সেটা চরম রূপ নিল। তারাসুন্দরী শিশির ভাদুড়ীর দলে যোগ দিলেন। অপরেশের মনের এই অস্থিরতার মাঝে কর্ণার্জুন অভাবনীয় জনপ্রিয়তার সঙ্গে চলছে। দিকে দিকে অপরেশচন্দ্রের জয়গান।

উনিশ শ' চব্বিশ সালের কথা। শিশির ভাদুড়ীর কানে এল মনমোহন পাঁড়ে থিয়েটার থেকে অবসর নেবেন। কোনো যোগ্য লোকের হাতে থিয়েটার দিয়ে তিনি অবসর নিতে চান। সে-সময়ে মনমোহন পাঁড়ে কলকাতা ছেড়ে কার্সিয়াং গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। খবর পাওয়ামাত্র শিশিরকুমার তাঁর ব্যারিস্টার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে কার্সিয়াং চলে গেলেন। মনমোহন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কলকাতায় শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে তিনি খুশি হয়েছিলেন। শিশিরকুমারের নাট্য প্রযোজনায় নতুন আঙ্গিক, নাটকের অভিনব উপস্থাপনা এবং অভিনয়-কলার নতুন ধারা দেখে তাঁর ভালো লেগেছিল। শিশিরের প্রস্তাব শুনে মনমোহন পাঁড়ে তাঁকে থিয়েটার লীজ দিতে রাজি হলেন। অবশ্য শর্ত ছিল খুবই কঠিন। থিয়েটারের মাসিক ভাড়া দু' হাজার সাত শ' পঞ্চাশ টাকা। সিকিউরিটি হিসাবে জমা রাখতে হবে পনেরো হাজার টাকা। সেই টাকা থেকে মাসিক ভাড়ার আড়াই শ' টাকা বাদ যাবে। আপাতত লীজের মেয়াদ থাকবে পাঁচ বছর। সে যুগের হিসাবে টাকার অঙ্কটা ছিল খুবই বড়ো। তবুও শিশিরকুমার সেই শর্তে রাজি হলেন। টাকার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর পরম শুভাকাঙ্ক্ষী নিমতিতার জমিদার মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী। নাট্যরসিক বিত্তবান হৃদয়বান এই মানুষটি শিশিরকুমারের নটজীবনের সূচনায় প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।

মনমোহন থিয়েটার তখনও ভাঙা আসর নিয়ে দানীবাবুই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন শুনলেন শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে মনমোহন পাঁড়ে চুক্তিবদ্ধ হতে

চলেছেন, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এতদিন সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে তিনিই থিয়েটার চালিয়ে এসেছেন। তার সঙ্গে পরামর্শ না-করে পাঁড়ে মহাশয়ের এই হঠকারিতা তাঁর ব্যক্তিত্বে ও মর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত করল। এর একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। দানীবাবু মনমোহন পাঁড়ের নামে হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দিলেন। ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন বিশ হাজার টাকা। তাঁর দাবীর সমর্থনে তিনি একটি চুক্তিপত্র দাখিল করলেন। তিন বছর আগে মনমোহন পাঁড়ের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়েছিল। তাতে বলা ছিল দানীবাবু এককভাবে মনমোহন থিয়েটার চালাবেন। মাসে আট শ' টাকা ভাড়া হিসাবে দেবেন। নিজের পারিশ্রমিক বাবদ তিনি মাসে আড়াই শ' টাকা নেবেন। টিকিট বিক্রির টাকা থেকে নট-নটী ও কর্মচারীদের মাইনে, গাড়ি ভাড়া, লাইসেন্স, কর্পোরেশন ট্যাক্স, টেলিফোনের বিল, স্টেজ ও নাট্যশালার সংস্কার ইত্যাদি যাবতীয় খরচের পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা মনমোহন পাঁড়ে ও দানীবাবু সমান অংশে ভাগ করে নেবেন। ব্যবসা পরিচালনার সব দায়িত্ব দানীবাবুর। আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার দায়িত্ব মনমোহনবাবুর। মাঝে এই চুক্তির শর্ত কিছু বদল হয়েছিল। দানীবাবুর মাইনে বেড়ে দাঁড়ায় চার শ' আর বাড়ি ভাড়া বারো শ'। আদালতে দানীবাবু বললেন, শর্তের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নতুন করে থিয়েটার লীজ দেওয়ার কোনো অধিকার মনমোহন পাঁড়ের নেই। মনমোহনের এই বেআইনি কার্যকলাপের জন্যে নাট্যামোদী জনসাধারণের কাছে তিনি হেয় হয়েছেন। নতুন লীজের কথা প্রচার হওয়ায় সাধারণ দর্শকের আস্থা হারিয়ে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এইসব কারণে তিনি বিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। তাছাড়া মনমোহনবাবু বেশ কিছুদিন আয়-ব্যায়ের কোনো হিসাব দেননি।

আসল কথা, থিয়েটার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে দানীবাবুর ব্যক্তিত্বে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। এ-মামলা তারই বহিঃপ্রকাশ। মামলার সমন পেয়ে মনমোহন পাঁড়ে একটুও বিচলিত হননি। তিনি বিচক্ষণ ব্যবসায়ী ছিলেন। দানীবাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গোপনে একটা মোটা টাকা দিয়ে মামলাটা থামিয়ে দিলেন। দানীবাবু বুঝেছিলেন, যে প্রীতি একবার ভেঙে যায় তা আর জোড়া লাগে না। চুক্তিপত্রটা ছিঁড়ে ফেলা হলো। মনমোহন পাঁড়ে সরে গেলেন মঞ্চ পরিচালনার ব্যক্তিগত দায়িত্ব থেকে। পরবর্তী দীর্ঘ সময় তিনি রয়ে গেলেন নেপথ্যে। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নেতৃত্বে নাট্যজগতে এক নবযুগের অভ্যুদয় হলো। মনমোহন থিয়েটারের নাম হলো মনমোহন নাট্যমন্দির। উনিশ শ' চব্বিশ

সালের আগস্ট মাসের ছ' তারিখে আবার সীতার অভিনয়। আগেই বলেছি অভিনেতা যোগেশ চৌধুরীর লেখা সীতা। মনমোহন হাতে নিয়ে শিশির-কুমার অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-কে নিয়ে এলেন। তাঁর অপূর্ব কণ্ঠদান নাট্যজগতে একটা যুগান্তর আনলো। শিল্প-নির্দেশক ছিলেন চারু রায়, গান রচনা করেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। আবহসংগীতের দায়িত্বে ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার যিনি পরবর্তীকালে আকাশবাণীর অন্যতম কর্মকর্তা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। সীতা নাটকের সঙ্গে শিশিরকুমার ডি. এল. রায়ের পাষাণী নাটকটিও মঞ্চস্থ করেন। সে-নাটকে গৌতম ও ইন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি নিজে, চিরঞ্জীব মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বামিত্র অমিতাভ বসু, রাম রবি রায়, অহল্যা প্রভা।

শিশির ভাদুড়ীর সাফল্যে বিপন্ন বোধ করল স্টার থিয়েটার। দানীবাবু তখন স্টারে মাঝে মাঝে অভিনয় করছেন। এসেছেন কুসুমকুমারী। এসেছেন তরুণ সুদর্শন নট নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টার থিয়েটারের সবচেয়ে বড়ো গর্ব তখন অহীন্দ্র চৌধুরীকে নিয়ে। অসাধারণ তাঁর অভিনয়শৈলী। দরাজ অনবদ্য কণ্ঠস্বর। অতুলনীয় অভিব্যক্তি। সেই জনচিত্তজয়ী শক্তিমান অভিনেতার ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা ভেবে স্টার থিয়েটার তাঁকে একটা চুক্তিতে বেঁধে ফেলল। শর্ত হলো—তিন বছরের মধ্যে তিনি স্টার থিয়েটার ছাড়তে পারবেন না। বায়োস্কোপে যদি অভিনয় করতে চান তাহলে শুধু-মাত্র ম্যাডান কোম্পানীর ফিল্মেই অভিনয় করতে পারবেন। অহীন্দ্রবাবু সানন্দে সেই শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। স্টার থিয়েটারে ডি. এল. রায়ের সাজাহান মঞ্চস্থ হলো। নামভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, আওরঙজেব দানীবাবু, দারা তিনকড়ি চক্রবর্তী, দিলদার নির্মলেন্দু লাহিড়ী, জাহানারা কুসুমকুমারী ও পিয়ারা আশ্চর্য-ময়ী। সাজাহানের চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরীর রূপারোপকে অতিক্রম করার মতো আজও কোনো অভিনেতার জন্ম হয়নি। এ একটা ইতিহাস।

উনিশ শ' বাইশ সালে মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে যাওয়ার পর সেই রঙ্গালয়টি পুনর্বিন্যাস করতে দীর্ঘ তিনবছর সময় লেগেছিল। উপেন্দ্র মিত্রকে ভাগ্যের সঙ্গে কঠিন লড়াই করতে হয়েছিল। তিনি জানতেন পুড়েও যা পোড়ে না তার নাম শিল্প। তার নাম সংস্কৃতি। আগুন সাজ পোড়ায়, সাজঘর পোড়ায়। পোড়াতে পারে না শিল্পীমন। সেই মন নিয়েই উনিশ শ' পঁচিশ সালে তিনি আবার মিনার্ভা নাট্যশালা চালু করলেন। কিন্তু সেটা চরম সংকটের দিন।

ওদিকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর মনমোহন নাট্যমন্দিরে পাষাণীর পর ভীষ্ম প্রযোজনা করলেন। নামভূমিকায় তিনি নিজে অভিনয় করেন। 'শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা রূপায়িত করেন নবাগত শক্তিমান নট শৈলেন চৌধুরী। সে-নাটকও হলো অভিনন্দনধন্য। শিশিরকুমারের তখন জয়জয়কার। পরের নাটক তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বসুর লেখা পুণ্ডরীক। সে-নাটক যোগ্য জনসমাদর পায়নি। সেই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের লোকান্তর ঘটে। তিনি ছিলেন শিশিরকুমারের আদর্শ ও পথ-প্রদর্শক। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর মৃত্যুর পরের দিন মনমোহন নাট্য-মন্দিরে অভিনয় বন্ধ থাকে।

পুণ্ডরীক নাটক সফল না-হওয়ায় শিশিরকুমার গিরিশ ঘোষের জনা নামালেন। প্রবীরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় চমক লাগিয়ে দিল। জনা নাটকে নীলধ্বজ নরেশ মিত্র, শ্রীকৃষ্ণ রবি রায়, জনা তারাসুন্দরী, মদনমঞ্জরী প্রভা, নায়িকা চারুশীলা ও বিদূষকের ভূমিকায় নৃপেন বসু। শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে স্টার থিয়েটারও জনা অভিনয় করল। সেখানে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন দানীবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী ও সুশীলাবালা।

এমন সময়ে হঠাৎ শিশিরকুমার বিপদে পড়ে গেলেন। বাড়িভাড়া কয়েক মাস বাকি পড়ায় মনমোহন পাঁড়ে হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দিলেন। থিয়েটার শুরুর দিন থেকে শিশির ভাদুড়ী দরাজ হাতে খরচ করেছেন। তাঁর শিল্পীমন বুঝতে চাইতো না টাকা-আনা-পাই-এর হিসাব। তাই এই বিপদ। যাই হোক, মনমোহন পাঁড়ের সঙ্গে কতকগুলো শর্তে মামলা মিটে গেল। কিছু দেনা আর অশান্তির বোঝা নিয়ে আবার তিনি কাজে মন দিলেন। আবার সীতার অভিনয় শুরু করলেন। সীতার জনপ্রিয়তা তখনও তুঙ্গে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে দীনেশরঞ্জনের বিজলী পত্রিকায় শিশির ভাদুড়ীর প্রশংসায় একটা কবিতা লিখে ফেললেন :

দীর্ঘ দুই বাহু মেলি আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে, সীতা সীতা সীতা
পলাতকা গোধূলি প্রিয়ারে,
বিরহের অস্তাচলে তীর্থযাত্রী চলে গেল ধরিত্রী দুহিতা
অন্তহীন মৌন অন্ধকারে।
যে কান্না কেঁদেছে যক্ষ কলকণ্ঠা শিপ্রা রেবা বেত্রবতী তীরে
তারে তুমি দিয়েছ যে ভাষা;
নিখিলের সঙ্গীহীন যত দুঃখী খুঁজে ফেরে বৃথা প্রেয়সীরে

তব কণ্ঠে তাদের পিপাসা।
এ বিশ্বের মর্মকথা উচ্ছ্বসিছে ওই তব উদার ক্রন্দনে,
ঘুচে গেছে কালের বন্ধন ;
তারে ডাকো, ডাকো তারে—যে প্রেয়সী যুগে যুগে চঞ্চল চরণে
ফেলে যায় ব্যগ্র আলিঙ্গন।
বেদনার বেদমন্ত্রে বিরহের স্বর্গলোক করিলে সৃজন
আদি নাই, নাহি তার সীমা ;
শুধু তুমি নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তব প্রত্যুষ স্বপন
চিত্তে তব ধ্যানের মহিমা।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত শিশির ভাদুড়ীর সাদর আহ্বান পেলেন। তাঁদের অন্তরঙ্গতা শিশিরকুমারের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

আরও এক কবি অন্তরের শ্রদ্ধা উজাড় করে শিশিরকুমারকে প্রশস্তি জানিয়েছিলেন। তিনি মোহিতলাল মজুমদার। নাট্যাচার্যকে তিনি লিপি পাঠালেন :

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তোমা হেরিনু যেদিন
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের শিশির-মুকুর !
চমকি চাহিনু উর্দ্ধে, নিশার চিকুর
দিগন্তের নীলাকাশে হয় যে বিলীন
হেরিলাম, কলা-লক্ষ্মী আজি এ নবীন
নেপথ্য লীলায় ধরি নবতন সুর
নয়ন মোহন কাব্যে নিপুণ নূপুর
বাজাইতে বঙ্গে আর নহে উদাসীন।
ছন্দ হেথা শরীরী যে, বাক্য হতমান।
শব্দ অর্থ প্রাণ পায় মূর্ত রস রাগে
হৃদয়ের রসাতলে যার অধিষ্ঠান
নরকণ্ঠ স্বরে তার কি আকুতি জাগে
প্রতি অঙ্গ কথা কয় রসনা সমান
শ্রোত্র চেয়ে নেত্র তাই কাব্যসুধা মাগে।

মনমোহন নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমারের সীতা তখনও অনন্য এবং অপরাজেয়।

ওদিকে মিনার্ভার উপেন্দ্রকুমার মিত্র স্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সোচ্চার

হলেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী ভাঙিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী তখন এক বহু-আলোচিত নট। দর্শকরা তাঁকে প্রিয় অভিনেতা বলে বরণ করে নিয়েছে। তাঁর ওপর উপেন্দ্র মিত্রের নজর পড়ে। তাঁকে তিনি মিনার্ভায় আনার চেষ্টা করছিলেন। এ-কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে রটনার সত্যতা যাচাই করার জন্যে স্টারের প্রবোধ গুহ অহীন্দ্রর বাড়িতে ছুটলেন। বাড়িতে তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। আশ্চর্যের ব্যাপার পরবর্তী অভিনয়-রজনীতে তিনি থিয়েটারে এলেন না। সারা কলকাতা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে অহীন্দ্র চৌধুরীর সন্ধান পাওয়া গেল না। ডিরেক্টর বোর্ডের অনুমতিক্রমে পরের দিন প্রবোধ গুহ অহীন্দ্র চৌধুরী ও উপেন্দ্র মিত্রের নামে হাইকোর্টে মামলা করলেন। সেটা উনিশ শ' পঁচিশ সালের সেপ্টেম্বর মাস। ক্ষতিপূরণের দাবি পঞ্চাশ হাজার টাকা।

কলকাতার রঙ্গজগতে সেদিন এক হৈ-হৈ কাণ্ড। এমন উত্তেজনাময় ব্যাপার এর আগে ঘটেনি। অহীন্দ্র চৌধুরী বিপদে পড়লেন। আদালতে হাজির হয়ে তিনি একটা হলফনামা দাখিল করলেন। বললেন, কয়েকদিন আগে উপেন্দ্রকুমার মিত্রের ভাইপো শিশিরকুমার মিত্র এবং শিশির পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ শিশিরকুমার বসু তাঁকে মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে যান। সেখানে অহীন্দ্র তাঁদের আপ্যায়নে প্রচুর মদ্যপান করে পানোন্মত্ত হয়ে পড়েন। সে-রাত্রে সেই আসরে কি ঘটেছিল তা তাঁর সম্যক মনে নেই। তবে ভাসা ভাসা মনে পড়ে কোনো একটি কাগজে তাঁকে দিয়ে সই করিয়া নেওয়া হয়েছিল। সে-রাত্রে অহীন্দ্র পানাধিক্যে এমনই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে বাড়ি ফিরতে পারেননি। সেই ঘটনার দু'দিন পরে তিনি মিনার্ভার মালিককে একখানি চিঠি লেখেন। তার নকল অহীন্দ্র আদালতে দাখিল করলেন :

বাবু উপেন্দ্র কুমার মিত্র
প্রোপ্রাইটর, মিনার্ভা থিয়েটার
৫, বিডন স্ট্রীট

মহাশয়,

আমার খুব আবছা মনে পড়ে গত রাত্রে শিশিরকুমার বসুর মাধ্যমে আপনি আপনার থিয়েটার বাড়িতে যখন আমাকে মদ্যপানে প্রায় জ্ঞানশূন্য করিয়াছিলেন, তখন আপনি আমাকে দিয়ে কোনো একটি দলিল সই করিয়ে নেন। যেহেতু আমি নেশায় আচ্ছন্ন ছিলাম, আমার সাক্ষরিত কাগজখানির মর্ম আমি জানতে পারিনি। সে সময়ে আমি মোটেই প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। স্বাক্ষরিত

কাগজখানি সজ্ঞানে সম্পাদিত না হওয়ার জন্য সেটি সর্বাংশে বাতিল ও পরিত্যজ্য। তথাপি যদি কোনো দলিলে আমি সই করে থাকি, তার একটি কপি দয়া করে পাঠালে বাধিত হব। এই চিঠি পাওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি আপনার কাছ থেকে কোনো জবাব না পাই তাহলে আমি ধরে নেব আপনার কাছে আমি কোনো কাগজ সই করিনি।

ভবদীয়

অহীন্দ্র চৌধুরী

সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও উপেন্দ্র মিত্র উপরোক্ত চিঠির কোনো জবাব দিলেন না। তখন অহীন্দ্র চৌধুরী গেলেন অ্যাটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্তর কাছে। হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন বিখ্যাত নট অমরেন্দ্রনাথ দত্তর অগ্রজ। হীরেন্দ্রনাথের পরামর্শে অহীন্দ্র হাইকোর্টে নালিশ করলেন—উপেন্দ্র মিত্র, শিশির মিত্র ও শিশির বসুর নামে। অহীন্দ্র আগে যে কথা বলেছিলেন সেটাই আবার সবিস্তারে বললেন। সেপ্টেম্বরের দু' তারিখে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে উত্তেজক পানীয় দ্বারা আপ্যায়িত করে উপেন্দ্র মিত্র কোনো একটি দলিলে তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নেন। এখন মনে হচ্ছে সেটি একটি চুক্তিপত্র। সতেরোই সেপ্টেম্বর থেকে তিনি মিনার্ভায় অভিনয় করবেন সম্ভবত এইরকম অঙ্গিকার ছিল সেই কাগজখানিতে। দেখা যাচ্ছে এই মর্মে শহরের পথে পথে পোস্টার পড়েছে। ছল-চাতুরী ও অপকৌশলে তাঁকে দিয়ে সই করানো কাগজটার কোনো দাম নেই। এই ষড়যন্ত্রের দুই নায়ক শিশিরকুমার মিত্র ও শিশিরকুমার বসু ভালোভাবেই জানতেন আর্ট থিয়েটার্সের সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ তখনও শেষ হয়নি।

এমন একটা ঘটনা ঘটবে উপেন্দ্র মিত্র আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলেন। তাই আদালতের সমন পেয়ে তিনি একটুও অবাক হননি। অ্যাটর্নি গনেশচন্দ্র দে'র কাছে গেলেন পরামর্শ নিতে। কোর্টে জবাব দাখিল করে তিনি বললেন, তাঁর ভাইপো শিশিরকুমার মিত্রের মাধ্যমে বেশ কিছুদিন ধরে অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভায় যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। তারই ফলস্বরূপ নিজের ইচ্ছায় এবং অন্যের বিনা প্ররোচনায় মাসিক তিন শ' টাকা মাইনেতে এবং এককালীন পাঁচ শ' টাকা বোনাস পেয়ে অহীন্দ্র তিন বছরের জন্য মিনার্ভায় যোগ দিয়েছেন। সজ্ঞানে এবং সুস্থচিত্তে তিনি এগ্রিমেণ্ট সই করেছেন। পরে তিনি তাঁর মত বদলেছেন এবং মিথ্যা ও হাস্যকর অছিলা নিয়ে বলছেন যে চূড়ান্ত মত্ত অবস্থায় তিনি এগ্রিমেণ্ট সই করেছেন। উপেন্দ্র মিত্র অহীন্দ্র চৌধুরীর নামে পাল্টা মামলা

করে পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন।

তিন তিনটে মামলায় সমস্ত ব্যাপারটাই ঘোরালো হয়ে উঠল। প্রথমটা আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড বনাম অহীন্দ্র চৌধুরী। দ্বিতীয়টা অহীন্দ্র চৌধুরী বনাম উপেন্দ্রকুমার মিত্র ও অন্যান্য, এবং শেষেরটা উপেন্দ্রকুমার মিত্র বনাম অহীন্দ্র চৌধুরী। তিনটি মামলার শুনানী একযোগে শুরু হলো। উপেন্দ্র মিত্রের পক্ষে তাঁর ভাইপো শিশির মিত্র সাক্ষ্য দিলেন। তিনি বললেন, আমি ইংরাজি ইলাসট্রেটেড শিশির ও বাংলা সচিত্র শিশির পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক। ব্যবসার খাতিরে নাট্যজগতের সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের ব্যাপারে বহু নট-নটীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। অহীন্দ্র চৌধুরী তাদের একজন। আমি আমার কাগজের কর্মাধ্যক্ষ শিশির বসুকে নিয়ে একদিন অহীন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। যাওয়াটা ছিল নেহাৎই সৌজন্যমূলক। সেদিন অহীন্দ্র কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেন, আর্ট থিয়েটার্সের সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তিন হাজার টাকা বোনাস ও মাসে তিন শ' টাকা মাইনে পেলে তিনি মিনার্ভায় যোগ দিতে রাজি আছেন। আমি আমার কাকা উপেন্দ্র মিত্রের কাছে সেই প্রস্তাব রাখি। আমার কাকা একটা শর্ত খসড়া করে দিলেন, সেই শর্তে অহীন্দ্রকে নিতে রাজি হলেন। আমি সেই খসড়া প্রস্তাব নিয়ে পরের দিন আবার অহীন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি যাই। তিনি বলেন, আর্ট থিয়েটার্সের প্রবোধ গুহর সঙ্গে কিছু আলোচনা করে তিনি উপেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা করবেন। কবে আসবেন তিনি বলে দিয়েছিলেন।

নির্দিষ্ট তারিখে সন্ধ্যায় অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভায় এলেন। সেখানে তাঁকে উপস্থিত শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সে-রাত্রে শঙ্খনাদ নামে একটা নাটক পড়া হয় এবং তার প্রয়োগ ও চরিত্রলিপি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়। তারপর অহীন্দ্রবাবু মিনার্ভায় যোগ দেওয়ার চুক্তি সই করে চলে যান। এই ঘটনার দু'দিন পরে অহীন্দ্র চৌধুরী আমার শিশির পত্রিকার অফিসে এসেছিলেন। সেখানে তখন কালীপ্রসাদ ঘোষ বসেছিলেন। আমাদের মধ্যে আবার শঙ্খনাদ নাটক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তার মাঝে আর্ট থিয়েটার্সের গণদেব গাঙ্গুলী এসে অহীন্দ্রবাবুকে ডেকে নিয়ে গেলেন। যাবার সময়ে অহীন্দ্র বলে গেলেন পরের দিন বেলা একটায় আসবেন। পরের দিন অহীন্দ্র এলেন না। আমি সন্ধ্যায় আমার অপর কাকা ইস্টার্ন রেলওয়ের অফিসার এন. কে. মিত্রের হাওড়ার বাড়িতে যাই। সেখানে অহীন্দ্র চৌধুরীর আকস্মিক আবির্ভাব

আমাকে বিস্মিত করে। অনেক অনুরোধ করে শিশির বসুকে নিয়ে তিনি সেখানে হাজির হয়েছেন। সেখানে সেই সন্ধ্যায় অহীন্দ্রবাবু খুব অসহায়ভাবে আমাকে বললেন, প্রবোধ গুহ, গণদেব গাঙ্গুলী ও গদাধর মল্লিক স্টার থিয়েটারে থাকার জন্যে তাঁকে ভীষণ চাপ দিচ্ছেন। আমাকে তিনি অনুরোধ করলেন, যদি আমি আমার কাকাকে রাজি করিয়ে তাঁকে তাঁর স্বাক্ষরিত চুক্তি থেকে মুক্ত করে দিতে পারি তাহলে আমার কাছে তিনি চিরবাধিত থাকবেন।

আমি সে কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, যে-চুক্তি দুজনের সম্মতিতে সই হয়েছে তা আর ভাঙা যাবে না। আমি এ-বিষয়ে কিছুই করতে পারব না। তবুও রাত্রে ফিরে এসে আমি আমার কাকা উপেন্দ্র মিত্রকে সব কথা বললাম। তিনি বললেন, অহীন্দ্রবাবুকে কোনোমতেই ছাড়া যাবে না। তিনি মিনার্ভায় যোগ দিয়েছেন এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গেছে। সব প্রশ্নের ওপর আমার ও মিনার্ভার একটা সম্মানের প্রশ্ন আছে। আমার কিছুই করার নেই।

তথাপি, একটা-কিছু মীমাংসার আশায় আমি নির্মলচন্দ্র চন্দ্রকে নিয়ে পরদিন অহীন্দ্রবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তাঁর বাবা আমাদের বললেন, প্রবোধ গুহ তাঁর ছেলেকে গদাধর মল্লিকের বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। বাড়ি আসতে দিচ্ছেন না। শিশির মিত্রের সাক্ষ্য এখানেই শেষ।

আরও অনেকে সাক্ষ্য দিলেন। কয়েকদিন ধরে বিতর্কিত শুনানী হলো। কিন্তু মিনার্ভা অহীন্দ্র চৌধুরীকে বাঁধতে পারল না। আদালতের বাইরে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় সব গোলমালের অবসান হলো। পূজাবকাশের পর বিচারপতি প্যাংক্রীজ তিনটি মামলাই খারিজ করে দিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী স্টার থিয়েটারেই রয়ে গেলেন। তখন কর্ণার্জুন মাঝে মাঝে চলছিল। এছাড়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের গোলকুণ্ডা ও রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভায় মুখ্য ভূমিকা ছিল অহীন্দ্র চৌধুরীর। এই সময়ে অ্যাটর্নি নির্মলচন্দ্র চন্দ্র পরিচালক পদ ছেড়ে দেন। তাঁর জায়গায় নতুন ডিরেক্টর হলেন গদাধর মল্লিক।

উনিশ শ' পঁচিশ সাল। কলকাতার নাট্যজগতে তখন প্রথম ও প্রধান নাম শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ঝিমিয়ে-পড়া মনমোহন থিয়েটার রূপে রঙে আলোয় আবার ঝলমল করে উঠল। থিয়েটার ভালো চলা সত্ত্বেও শিশিরকুমার পদে পদে বাধা পেতে লাগলেন। অন্যান্য থিয়েটারগুলো নানারকম বিরুদ্ধ প্রচার চালিয়ে

যেতে লাগল। ব্যবসার খাতিরে নিজের রুচিকে তিনি কোনো দিন নিম্নগামী হতে দেননি। তিনি লক্ষ লক্ষ দর্শক তৈরি করে গেছেন। তাঁদের পৌঁছে দিয়েছেন রসের আনন্দলোকে। কিন্তু টাকা-পয়সার হিসেবটা তিনি বোঝার চেষ্টা করেননি। মাত্র এক মাসের ভাড়া বাকি পড়ার জন্যে মনমোহন পাঁড়ে তাঁর নামে আবার মামলা করে বসলেন। এবং তার পরে আরও একটি মামলা। বাড়ি ভাড়া ও মামলার খরচ মেটাতে শিশিরকুমারের মাথায় বেশ কিছু দেনা চেপে গেল। অবশেষে এক নতুন পরিকল্পনা করলেন তিনি। থিয়েটার ব্যবসাটাকে যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ার কথা তিনি ভাবলেন। উনিশ শ' ছাব্বিশের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠা হলো নাট্যমন্দির লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন ধার্য হলো পাঁচ লক্ষ টাকা। প্রতিটি শেয়ারের দাম এক শ' টাকা। ভাগ্যলক্ষ্মী সেদিন আড়ালে হেসেছিলেন। যৌথ ব্যবসা চালু হওয়ার মাত্র একমাস পরে শিশিরকুমারের অকৃত্রিম বন্ধু নিমতিতার জমিদার মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী মারা গেলেন। তাঁকে শক্তি দেওয়ার, সাহস দেওয়ার, আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ার লোকটি চলে গেল। উনিশ শ' ছাব্বিশ সালের মার্চ মাসে শিশির ভাদুড়ীর ভাগ্যাকাশে আবার কালো মেঘের আবির্ভাব। মনমোহন পাঁড়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা আনলেন। লিমিটেড কোম্পানীর ওপর তিনি আস্থা রাখতে পারলেন না। মাত্র তিনমাসের ভাড়া বাকি। এগ্রিমেণ্টে বাড়ি ভাড়ার আর্থিক দায়িত্বে ছিলেন দুজন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী। মহেন্দ্র মারা যাওয়ার কারণে তাঁর ছেলেদের পার্টি করা হলো। তিন ছেলে প্রভাতকুমার, প্রতিভাকুমার ও রাধানাথকে আদালতে হাজির হতে হলো। মনমোহন পাঁড়ের পাওনা তখন সাত হাজার পাঁচশ বাষট্টি টাকা চোদ্দ আনা। তিনি বললেন, শিশির ভাদুড়ীর ওপর আমার কোনো ব্যক্তিগত বিরূপতা নেই। আমি সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের অনুকূলে ট্রাস্ট করে দিয়েছি। তাদের মুখ চেয়েই আমাকে মামলা দায়ের করতে হয়েছে। এত টাকা বাড়ি ভাড়া ফেলে রাখতে ট্রাস্টিরা রাজি নন। শিশিরকুমারের বলার মতো কিছুই ছিল না। পাওনা টাকা দিতেই হবে। টাকা দিয়ে তিনি অব্যাহতি পেলেন। ঋণমুক্তির জন্যে নতুন ঋণের জালে তিনি জড়িয়ে পড়লেন।

আদালতের ঝামেলা চুকিয়ে শিশিরকুমার থিয়েটারে মন দিলেন। আবার বিপর্যয়। একটা প্রচলিত কথা আছে—দুর্ভাগ্য একা আসে না। হিসেব করেও আসে না। সেই বছর এপ্রিল মাসে কলকাতায় দেখা দিল রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। একটানা কয়েকমাস ধরে চলল সেই হিংসাত্মক হানাহানি। আমোদ-আনন্দ

দূরে থাক, প্রাণ বাঁচানোই সমস্যা। থিয়েটার জনশূন্য। মাথায় লোকসানের বোঝা চাপতে লাগল। শিশিরকুমার হাত পাতলেন কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের কাছে। ব্যাঙ্ক তাঁকে নিয়মিত সাহায্য করতে লাগল। কিছুদিন পরে তিনি মনমোহন পাঁড়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এক শ' আটত্রিশ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে ম্যাডানদের কর্ণওয়ালিশ মঞ্চ ভাড়া নিয়ে শুরু করলেন নাট্যমন্দিরের দ্বিতীয় প্রয়াস। শরৎচন্দ্রের ষোড়শী নাটক নামালেন। জীবানন্দর চরিত্র রূপায়ণ তাঁর জীবনের একটা অক্ষয় কীর্তি। ষোড়শীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল চারুশীলা, পরে প্রভা। অন্যান্য মুখ্য ভূমিকায় যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এর পর অভিনীত হয় পৌরাণিক নাটক নরনারায়ণ। ভূমিকালিপিতে ছিলেন কর্ণ শিশিরকুমার ভাদুড়ী, কৃষ্ণ বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, অর্জুন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যুধিষ্ঠির যোগেশ চৌধুরী, ভীম অমিতাভ বসু ও দ্রৌপদী চারুশীলা।

উনিশ শ' ছাব্বিশ সালে কলকাতার আলফ্রেড মঞ্চে আর একটি থিয়েটার জন্ম নেয়। তার নাম মিত্র থিয়েটার। মিনার্ভার একদা অংশীদার পরলোকগত মহেন্দ্র মিত্রের এক ভাই জ্ঞানেন্দ্র মিত্র ও মহেন্দ্র মিত্রের ছেলে শিশির মিত্র সেই থিয়েটার খোলেন। পরামর্শদাতা ও পরিচালক হিসাবে যোগ দিলেন অমৃতলাল বসু। নাটক খোলা হলো বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তর শ্রীদুর্গা, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডার্বি টিকিট ও মনোমোহন গোস্বামীর সংসার। কুশীলবদের মধ্যে ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরী, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সেখানে যোগ দিয়েছিলেন নবাগত জীবন গাঙ্গুলী এবং হরিমোহন বসু। এঁরা দুজনেই পরবর্তীকালে ছায়াচিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তখন স্টার থিয়েটারে অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের নতুন নাটক শ্রীকৃষ্ণ মঞ্চস্থ হলো। নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, বলরাম মণীন্দ্র ঘোষ, জরাসন্ধ দুর্গাপ্রসাদ বসু, বিদুর তুলসী চক্রবর্তী, দুর্যোধন অহীন্দ্র চৌধুরী ও অর্জুন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওদিকে নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার ভাদুড়ী নতুন পরীক্ষায় নামলেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক অভিনয়ের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা কেবল তাঁর দ্বারাই সম্ভব ছিল। রঘুপতির ভূমিকায় তিনি নিজে অভিনয় করেছিলেন। রাজা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নক্ষত্র রায় নরেশ মিত্র, জয়সিংহ রবি রায়, রানী চারুশীলা, অপর্ণা উষাবতী ও অন্ধ ভিক্ষুকের ভূমিকায় অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে।

উনিশ শ' সাতাশ সালের পয়লা জুলাই শুভদিনে স্টার থিয়েটার অপরেশ-চন্দ্রের শ্রীরামচন্দ্র নাটক খুলল। সেই নাটকে রাবণ ও দশরথের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, রাম দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কৈকেয়ী সুশীলা-সুন্দরী, সীতা ছোটো সুশীলা, শর্বরী আশ্চর্যময়ী ও মারুতি তুলসী চক্রবর্তী।

আশায়-নিরাশায় উৎকণ্ঠায়-উত্তেজনায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী নাট্যমন্দির নিয়ে একটা বছর কাটালেন। সাতাশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে আবার হাইকোর্টে দুটি মামলা রুজু হলো। একটি মামলা করেছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, অপরটি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দাবী পাঁচ হাজার একত্রিশ টাকা। আর্জিতে বক্তব্য ছিল এই যে. তিন মাস আগে শিশিরকুমার নন্দরাম দাস মথুরা দাস নামে কোনো এক ফার্মের কাছে দু'খানি হুণ্ডি কেটেছিলেন। হুণ্ডিতে যথাক্রমে ষাট ও পঁচাত্তর দিনের মেয়াদে টাকা শোধ করার অঙ্গীকার করেছিলেন তিনি। নির্দিষ্ট দিনে টাকা না-পেয়ে তারা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কাছে হুণ্ডি দু'খানি অ্যাসাইন করে দিয়েছিল। আদালতের সমন পেয়েও শিশিরকুমার হাজির হতে পারলেন না। কারণ, হুণ্ডির মামলা লড়তে গেলে সমপরিমাণ টাকা জমা রাখতে হয় আদালতের কাছে। টাকা কোথায়? ফলে সাতাশ সালের এগারো এপ্রিল তারিখে বিচারপতি গ্রেগরীর এজলাসে মামলা একতরফা ডিক্রি হয়ে গেল।

ডিক্রি পাওয়ার পর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অনেকদিন অপেক্ষা করেছিল। অনেক সময় দিয়েছিল শিশিরকুমারকে। শেষপর্যন্ত আটাশ সালের সাতাশে নভেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের একতরফা আবেদনে শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হলো। কোনোরকমে টাকা জোগাড় করে আদালতের আদেশকে রুখলেন শিশিরকুমার। অনেক মূল্য দিয়ে সম্মান বাঁচালেন।

অপরটিও হুণ্ডির মামলা। দাবী পনেরো হাজার টাকা। শিশিরকুমার আরও তিনখানি হুণ্ডি কেটেছিলেন মথুরা দাস নন্দরাম দাসের কাছে। প্রতিটি হুণ্ডি ছিল পাঁচ হাজার টাকার। নন্দরাম দাস মথুরা দাস সেগুলি হস্তান্তর করেছিল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কাছে। এবারেও হাজির হতে পারলেন না শিশির-কুমার। মামলা একতরফা ডিক্রি হয়ে গেল। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটা রফায় এলেন শিশিরকুমার। মাসে মাসে সুদ ও আসল কিছু দিয়ে ডিক্রি জারি স্থগিত রাখলেন। কয়েক মাস টাকা দেওয়ার পর আর দিতে পারলেন না। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে শিশিরকুমারের সারাটা দিন আদালতেই কেটে যায়।

শিশিরকুমার দিশাহারা হয়ে পড়লেন। সাতাশ সালের এপ্রিল মাসে আবার একটা নতুন মামলা রুজু হলো। তাঁর তিনবছর আগে পটলডাঙ্গা স্ট্রিটের কোনো এক প্রতুল চ্যাটার্জির কাছে একখানি হাতচিঠিতে তিনি পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়ে ছিলেন। ধার দেওয়ার কিছুদিন পরেই প্রতুলচন্দ্র মারা যান। তাঁর উত্তরাধিকারী দুই ছেলে সুবোধচন্দ্র ও অপ্রকাশ চ্যাটার্জি শিশির ভাদুড়ীর নামে নালিশ করলেন। যাই হোক, শিশিরকুমার আদালতের বাইরে এই মামলাটা মিটমাট করে নিলেন। বাদীপক্ষ আর অগ্রসর হয়নি।

হ্যারিসন রোডের আলফ্রেড থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে মনমোহন পাঁড়ের কাছে মনমোহন মঞ্চ ভাড়া নিয়ে মিত্র থিয়েটার ব্যবসা শুরু করল। নাটক নামানো হলো দেবলাদেবী, রানী দুর্গাবতী, বাজিরাও ও চন্দ্রশেখর। অহীন্দ্র চৌধুরী তখন স্টার থিয়েটারেই ছিলেন। স্টারের সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ উনিশ শ' সাতাশ সালের চোদ্দ এপ্রিল শেষ হওয়ার কথা। মাত্র কটা দিন তখন বাকি। অহীন্দ্র মিত্র থিয়েটারের জ্ঞানেন্দ্র মিত্রকে পাকা কথা দিয়ে সেখানে যোগ দেবেন বললেন। মেয়াদ শেষ হলে তিনি স্টার ছেড়ে দেবেন বলে কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিলেন। নোটিশ দেওয়ার পর স্টারের অনুরোধে জলপাইগুড়িতে অভিনয় করতে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করতে হলো। কিন্তু তাঁর শরীর খারাপের কথা বিশ্বাস না-করে স্টার তাঁর কাছে ডাক্তারের সার্টিফিকেট চেয়ে বসল। ফলে স্টারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা রীতিমতো তিক্ত হয়ে উঠল। সুস্থ হওয়ার পরও রাগ করে তিনি বাড়িতে বসে রইলেন। স্টার থিয়েটার বিপদে পড়ল। কারণ, মুখ্য ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় তখন একটা বিপুল সংখ্যক দর্শককে আকর্ষণ করত। কলকাতার নাট্যরসিকদের কাছে তাঁর চাহিদা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্টারের চলতি নাটক বন্ধ হয়ে গেল। উনিশ শ' সাতাশ সালের এপ্রিলের আট তারিখে স্টার থিয়েটার তাঁর নামে হাইকোর্টে নালিশ করল। মিত্র থিয়েটারে তাঁর মঞ্চাবতরণ স্থগিত রাখার জন্যে নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করল। এই মামলায় অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্র মিত্র ও শিশির বসুকে জড়িয়ে দিল। ক্ষতিপূরণ হিসেবে অহীন্দ্র চৌধুরীর কাছে দাবী করল দু'হাজার টাকা এবং যত দিন তিনি থিয়েটারে অনুপস্থিত থাকবেন দৈনিক দু' শ' টাকা। মিত্র থিয়েটারের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবী দশ হাজার টাকা। স্টার থিয়েটারের বক্তব্য, ছাব্বিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অহীন্দ্র চৌধুরী নতুন করে স্টারের সঙ্গে যে-চুক্তি

স্বাক্ষর করেছিলেন তা শেষ হতে অনেক দেরি। অহীন্দ্র চৌধুরী অবশ্য এই নতুন চুক্তিপত্রের কথা অস্বীকার করেছিলেন।

এই মামলায় মিত্র থিয়েটার সমূহ বিপদে পড়ল। জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র আদালতে এসে বললেন, মনমোহন মঞ্চে বর্তমানে ব্যবসারত মিত্র থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী আমি। উনিশ শ' ছাব্বিশ সালের দোসরা এপ্রিল আমি এই থিয়েটার চালু করি, সেটা অবশ্য হ্যারিসন রোডের আলফ্রেড মঞ্চে। অহীন্দ্র আগামী চোদ্দ তারিখ থেকে আমার থিয়েটারে অভিনয় করবে বলে তিন বছরের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়। কথা হয় সে সাড়ে তিন শ' টাকা মাসিক বেতন নেবে এবং বছরে পঁচিশ টাকা বাড়বে। আমি তাকে চার হাজার টাকা বোনাস দিতে রাজি হই এবং অগ্রিম পাঁচ শ' টাকা ও একমাসের মাইনে দিই। চুক্তিপত্র সই হয় সতেরো মার্চ তারিখে একজন নোটারি পাবলিকের সামনে! অহীন্দ্র চৌধুরী স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছেন। আমি তাঁকে কোনোরকমেই প্ররোচিত করিনি। আগামী ইস্টারের ছুটিতে মিত্র থিয়েটার প্রযোজিত নাটকে প্রধান ভূমিকায় তাঁর অভিনয় করার কথা। আর্ট থিয়েটার্স আমার বিরুদ্ধে নালিশ করায় আমার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। এজন্যে আমিও কম ক্ষতিগ্রস্ত নই।

শিশিরকুমার মিত্র অহীন্দ্রকে সমর্থন করে বললেন, আমি কোনদিনই অহীন্দ্রকে মিত্র থিয়েটারে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিইনি। তবে মিত্র থিয়েটারে যোগ দেবে এ-কথা সে আমাকে বলেছিল। জ্ঞানেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যখন তার চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি জ্ঞানেন্দ্র মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি শিশির পত্রিকার সম্পাদক। স্টার থিয়েটারের নাটক সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচনায় ওরা হয়তো রুষ্ট। তাই আমাকে এই মামলায় ওরা জোর করে টেনে এনেছে।

শিশিরকুমার বসু একটি হলফনামা দাখিল করে বললেন, অহীন্দ্র আমার বিশেষ বন্ধু। আমার প্ররোচনায় সে মিত্র থিয়েটারে যোগ দিয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্টার থিয়েটারের প্রবোধ গুহর সঙ্গেও আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব আছে। আমি পেশায় সাংবাদিক। স্টারের সম্পর্কে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা করি বলে আমাকে এই মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে।

স্টার থিয়েটারের পক্ষে প্রবোধচন্দ্র গুহ তারপর এগিয়ে এলেন যোদ্ধার ভঙ্গিমায়। তিনি বললেন অসুস্থতার অজুহাতে অহীন্দ্র চৌধুরীর থিয়েটারে

অনুপস্থিত হওয়াটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা জানি সেই সময়ে এক ব্যালে নর্তকী ফিরোজাবালাকে নিয়ে তিনি মধুপুর গিয়েছিলেন। তাঁর নামে এই মামলা রুজু না-করলে তিনি নিশ্চয়ই মিত্র থিয়েটারে অংশগ্রহণ করতেন। ছাব্বিশ সালের সেপ্টেম্বরের দু' তারিখে অ্যাটর্নি সুশীলচন্দ্র সেনের সামনে বসে আরও তিন বছর আমাদের কাছে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। সেই মর্মে একটা খসড়াও তৈরি করা হয়। তারপরই তিনি কাজ ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দেন। বিবৃতির মাধ্যমে প্রবোধ গুহ আরও গভীরে গেলেন। অনেক আপত্তিকর ব্যক্তিগত ঘটনাকে তিনি আদালতে টেনে আনলেন। তিনি বললেন, অহীন্দ্রর বাবা চন্দ্রভূষণ চৌধুরী হাইকোর্টের অফিসিয়াল রিসিভার কে. এস. ব্যানার্জির অভিযোগক্রমে তহবিল তছরূপের দায়ে একটা মামলায় জড়িয়ে পড়েন। অহীন্দ্রর অনুরোধে এবং আমারই চেষ্টায় সেই মামলা মিটে যায়। অ্যাটর্নি সুশীলচন্দ্র সেনের হস্তক্ষেপে সেই জটিল ব্যাপার মীমাংসায় আমাকে সাহায্য করেছিলেন অ্যাটর্নি জি. সি. দে এবং ব্যারিস্টার এস. সি. বোস। তাঁর বাবাকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে কৃতজ্ঞতাবশে অহীন্দ্র আমাদের সঙ্গে আরও তিন বছর থাকবে বলে অঙ্গীকার করে। তার কথামত খসড়া এগ্রিমেণ্ট তৈরি করা হয়। তারপর সে পিছু হাঁটে।

প্রবোধ গুহ আদালতে জনসমক্ষে অহীন্দ্র চৌধুরীকে হেয় করার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। মানুষের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ-মনোমালিন্য হয়েই থাকে। কিন্তু শালীনতা বিসর্জন দিয়ে যে নগ্ন কুৎসিত ভাষায় প্রবোধ গুহ অহীন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন তা চিন্তার অতীত। তিনি তাঁর দাখিল করা হলফনামায় বলেছিলেন, মার্চের শেষে অহীন্দ্র যখন থিয়েটারে আসা বন্ধ করেছিলেন তখন তাঁর বাবা একদিন থিয়েটারে এসে বলেন তাঁর ছেলে কয়েকদিন ধরে বাড়িতে আসছে না। চন্দ্রভূষণ পুলিশে ডায়রী করেছিলেন যে শিশিরকুমার মিত্র ও শিশিরকুমার বন্ধু নর্তকী ফিরোজবালার সাহায্যে তাঁর ছেলেকে আটকে রেখেছে। এ-কথা অহীন্দ্রর বাবা চন্দ্রভূষণের কাছেই আমার শোনা।

সবশেষে প্রবোধ গুহ বললেন, আমি যতদূর জানি মিত্র থিয়েটারের আগামী নাটক ইরাণের রানীতে অহীন্দ্র প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। আদালতের কাছে তিনি ইনজাংশনের প্রার্থনা জানালেন।

প্রবোধ গুহকে সমর্থন করে আদালতে আর যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে আশুতোষ চক্রবর্তী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর। তাঁরা দুজনেই

স্টার থিয়েটারে ছোটো ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তাঁরা দুজনেই বললেন, যে-সময়ে অহীন্দ্র অসুস্থতার জন্য থিয়েটারে আসা বন্ধ করেছিলেন সে-সময়ে তাঁরা রাজা রাজকিষেণ স্ট্রিটে শিশিরকুমার বসুর বাড়িতে অহীন্দ্রর সঙ্গে দেখা করেছেন। অহীন্দ্রর সুপারিশে অরোরা কোম্পানীর বায়োস্কোপ ফিল্মে অংশ নেওয়ার আশায় তাঁরা তার সঙ্গে দেখা করতে যান। অহীন্দ্র সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন তাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন।

সাতাশ সালের বারো মে এই মামলায় অহীন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। আদালত থেকে পুনরাদেশ না-দেওয়া পর্যন্ত মিত্র থিয়েটার বা অন্য কোনো থিয়েটারে কোনো অভিনয়ে তিনি অংশ নিতে পারবেন না। স্টার থিয়েটারের পক্ষে ব্যারিস্টার ছিলেন ল্যাংফোর্ড জেমস, এন. এন. সরকার ও বি. সি. ঘোষ। প্রতিবাদীপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এস. এন. ব্যানার্জী ও পি. দে। তারপর সাতাশে জুন তারিখে বিচারপতি কস্টেলোর এজলাসে এই জটিল মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হলো একটি আপসনামায়। শর্ত ছিল, তিরিশ সালের তেরো এপ্রিল পর্যন্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মিত্র থিয়েটার বা অন্য কোনো থিয়েটারে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। ওই সময় পর্যন্ত তাঁকে স্টারেই থাকতে হবে। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অহীন্দ্র স্টার থিয়েটারকে পাঁচ শ' টাকা দেবেন। স্টার থিয়েটার তাঁর ওপর থেকে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিল। কিন্তু এই মামলায় স্টার থিয়েটারের যা খরচ হয়েছে তা অহীন্দ্রকে দিতে হবে। পরাজয়, অপমান আর অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। জীবনটাই নাটক। আমরণ তাঁকে স্টার থিয়েটারের কাছে দাসখৎ লিখে দিতে হবে? ওদের নাগপাশ থেকে তাঁর কি মুক্তি নেই?

আর্ট থিয়েটার্সের সঙ্গে এই বৃহৎ মামলায় মিত্র থিয়েটারকে অনেক লোকসানের ঝুঁকি নিতে হলো। মামলার বিপুল খরচ সামলে ওঠা কষ্টকর হয়ে উঠল। তবুও নিরাশ না-হয়ে মিত্র থিয়েটার নাটক পরিবেশন অব্যাহত রাখল। অন্যান্য নাটকের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের জনা নাটক নামানোর জন্যে তারা তৈরি হলো। এমন সময়ে আবার স্টার থিয়েটারের কাছ থেকে বাধা এল। জনা বন্ধ করার জন্যে মামলা করল স্টার। দানীবাবুর কাছে তারা ইতিমধ্যেই জনার একচেটিয়া মঞ্চস্বত্ব কিনে রেখেছে। সাজপোষাক ও প্রস্তুতিপর্বের জন্যে মিত্র থিয়েটার যা-কিছু খরচ করেছিল তার সবটা জলে গেল। এইসব কারণে থিয়েটারের আয়ুকে মিত্ররা

দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেননি।

মনমোহন মঞ্চ থেকে মিত্র থিয়েটার বিদায় নেওয়ার পর প্রবোধ গুহর মাথায় ভূত চাপল। আর্ট থিয়েটার্সের হয়ে সেটি তিনি ভাড়া নিলেন। অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের নতুন নাটক শ্রীরামচন্দ্র দিয়ে ব্যবসা শুরু হলো। রাবণ আর দশরথের দ্বৈত ভূমিকায় ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, রাম দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ ইন্দু মুখোপাধ্যায়, সীতা ছোটো সুশীলা ও কৈকেয়ী সুশীলাসুন্দরী।

দানীবাবু কিছুদিন মঞ্চের বাইরে ছিলেন। স্ত্রী অমৃতমণির মৃত্যুতে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। থিয়েটার ভুলে কয়েকমাস তিনি বিশ্রাম নিলেন। তারপর আবার ফিরে এলেন। মনমোহন মঞ্চে আর্ট থিয়েটার্সে সাজাহান নাটকে দানীবাবু আওরঙজেব ও সাজাহান অহীন্দ্র চৌধুরী। আর্ট থিয়েটার্সের শিল্পীরা পালা করে কখনও স্টারে কখনও মনমোহনে অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু একসঙ্গে দুটো থিয়েটার চালানো ক্রমশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। তখন আর্ট থিয়েটার্স অরোরা ফিল্ম কোম্পানির অনাদিনাথ বসুর সঙ্গে একটা এগ্রিমেণ্ট করল। দৈনিক এক শ' টাকা হিসাবে ভাড়া দিয়ে থিয়েটার চালাবেন অনাদিনাথ। কেবলমাত্র আর্ট থিয়েটার্সের শিল্পীরাই অভিনয় করবেন। টিকিট বিক্রির টাকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পাবে আর্ট থিয়েটার্স। দশ ভাগ বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ হবে আর বাকি চল্লিশ ভাগ পাবেন অনাদিনাথ বসু। চুক্তিতে আরও ছিল যে আর্ট থিয়েটার্স মনমোহন পাঁড়েকে প্রতিদিন আটখানা ফ্রি পাশ দেবে। মনমোহনবাবু প্রতিবছর থিয়েটার সংস্কার করে দেবেন। নতুন ব্যবস্থাপনায় নতুন উদ্যমে থিয়েটার চালু হলো।

সে সময়ে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর নিয়মিত অভিনয়পর্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন নাট্যমন্দিরে অভিনীত হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ অবলম্বনে শেষরক্ষা, চিরকুমার সভা ও অন্য একটি ঐতিহাসিক নাটক যোগেশচন্দ্রের দিগ্বিজয়ী। কিন্তু শান্তি বোধহয় শিশিরকুমারের কপালে লেখা ছিল না। আটাশ সালের আগস্ট মাসে তাঁর বন্ধু প্রয়াত মহেন্দ্রনাথ চৌধুরীর তিন ছেলে প্রভাতকুমার, প্রতিভাকুমার ও রাধানাথ তাঁর নামে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল। তাদের কাছে শিশিরকুমারের সই করা একটা হাতচিঠি ছিলো। বাবা মহেন্দ্রনাথকে লেখা আড়াই হাজার টাকার প্রতিশ্রুতিপত্র।

সমন পেয়ে আদালতে হাজির হয়ে তিনি মামলাটা মিটিয়ে নেওয়ার আবেদন

জানালেন তাঁর বন্ধুপুত্রদের। তাঁর অসহায় অবস্থা দেখে প্রতিপক্ষ সহানুভূতি দেখাল। অত্যন্ত সহজ শর্তে তারা মামলাটা মিটিয়ে নিল। উনত্রিশ সালের সাতাশে ফেব্রুয়ারি তারিখে দু'পক্ষের সম্মতিতে একটা সোলেনামা দাখিল হলো। তাতে তিনটি প্রধান শর্ত ছিল—এক. দু' হাজার পাঁচ শ' টাকার ডিক্রি মেনে নিলেন শিশিরকুমার; দুই. শিশিরকুমার মাসিক এক শ' টাকা হিসাবে দেনা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। প্রথম কিস্তি সোলেনামা সই হওয়ার দিন দিতে হবে; তিন. টাকা নিয়মিত দিলে ডিক্রি জারী হবে না। পর পর তিনমাস টাকা না-দিলে সমস্ত বকেয়া টাকার জন্যে ডিক্রি জারী করা হবে।

কিন্তু আপসনামা দাখিলের সময়ে এক শ' টাকা দেওয়ার পর শিশির-কুমার আর টাকা দিতে পারেননি, কেবলমাত্র একটি কিস্তি ছাড়া। প্রায় এক বছর অপেক্ষা করার পর মহেন্দ্রকুমারের ছেলেরা শিশিরকুমারের সম্পত্তি ক্রোক করার জন্যে আদালতে আবেদন জানাল। তাতেও তারা সফল হলো না। শিশিরকুমার তখন নানা জালে জড়িয়ে আছেন। অগত্যা তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠানোর প্রার্থনা জানালো তারা। সেই আবেদন মঞ্জুর হলো। তবে, সুখের কথা, শেষপর্যন্ত আদালতের আদেশ কার্যকরী করা হয়নি। মহেন্দ্রনাথের ছেলেরা রাগ-বিদ্বেষ ভুলে পিতৃবন্ধুকে অব্যাহতি দিয়েছিল। কিন্তু এত দুঃখ দুর্বিপাকেও শিশিরকুমার হারিয়ে যাননি। একজনকে তিনি পেয়েছিলেন যে তাঁকে সাহস দিয়েছিল, দিয়েছিল প্রেরণা। তাঁকে নিয়েও তিনি জড়িয়ে পড়লেন আর-একটা মামলায়। তাঁর নাম কঙ্কাবতী।

কঙ্কাবতী সাহু। একটি ঝংকারময় নাম। এ-নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সে-যুগের নাট্যলোকের একটি ছোট্ট অধ্যায়। জড়িয়ে আছে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাম। কঙ্কাবতী ছিলেন সেকালের নাট্যাকাশের একটা ক্ষণস্থায়ী তারা। জীবনের শুরুতেই তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হলো একটা জটিল মামলায়। আটাশ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি কলকাতার পথে পথে স্টার থিয়েটার পোস্টারে ছেয়ে ফেলল যে কঙ্কাবতী সেখানে যোগ দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্টারের প্রবোধ গুহ কঙ্কাবতীর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন:

মহাশয়

আমি আর্ট থিয়েটার্সে যোগ দিয়েছি এই মর্মে আপনারা পথে পথে পোস্টার লাগিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমার কোনো চুক্তি হয়েছে বলে মনে

পড়ে না। সুতরাং আপনাদের এই বিজ্ঞাপনের সপক্ষে লিখিত চুক্তিপত্র যা আছে তা আমার গোচরে আনলে বাধিত হব। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করবেন।

কঙ্কাবতী সাহু

২৯ জুন ১৯২৮

স্টার থিয়েটার কঙ্কাবতীর চিঠির কোনো উত্তর দিল না। আইনের পরামর্শ নিয়ে প্রায় এক সপ্তাহ পরে তারা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল। সে-মামলায় শিশির-কুমার ভাদুড়ীর নামটাও যুক্ত হলো। প্রবোধ গুহ বললেন, জুন মাসের দশ তারিখে কয়েকটি বিশেষ শর্তে কঙ্কাবতী আগামী তিন বছর স্টারে অভিনয় করবে বলে একটি চুক্তিপত্রে সই করেছে। চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য কোনো থিয়েটার, গ্রামোফোন কোম্পানী বা রেডিওতে সে কোনো অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবে না। চুক্তিভঙ্গের জন্যে প্রবোধ গুহ কঙ্কাবতী ও শিশির ভাদুড়ী প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করলেন। কঙ্কাবতীর বিরুদ্ধে তিনি আদালতের কাছে ইনজাংশন চাইলেন। রুল জারির প্রার্থনা জানালেন কেন তিনি নাট্যমন্দিরে যোগ দিয়েছেন এবং কেন স্টার থিয়েটারে অভিনয় করবেন না। আর্জিতে প্রবোধ গুহ শিশির ভাদুড়ীকেই বেশি করে দায়ী করেছিলেন কঙ্কাবতীর এই চুক্তিভঙ্গের জন্যে। শিশিরকুমারই তাঁকে স্টারে অভিনয় করা থেকে বিরত করেছেন। এই অভিযোগটাই তিনি বড়ো করে তুলে ধরলেন।

ইনজাংশনের আবেদনের শুনানীর সময়েই এই মামলার চূড়ান্ত শুনানী শুরু হলো। উদ্ঘাটিত হলো অনেক তথ্য। অনেক কথা। অনেক কাহিনী। স্টার থিয়েটারের সেক্রেটারী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী হলফনামা দাখিল করে বললেন, জুন মাসের দশ তারিখে কঙ্কাবতী স্টারে অভিনয়ের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হন। উনিশ তারিখে তিনি থিয়েটারে এসে বলেন, তাঁর শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। তাঁর প্রথম মঞ্চাব-তরণের দিনটি পিছিয়ে দেওয়া হোক। এ-কথা শুনে প্রবোধবাবু খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি কঙ্কাবতীকে নিয়ে ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বোসের কাছে যান। সঙ্গে আমিও ছিলাম। ডাক্তার বোস তাঁকে পরীক্ষা করে কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনদিন পরে আমি কঙ্কাবতীকে দেখতে তাঁর বাড়িতে যাই। সেখানে গিয়ে শুনি তিনি নাট্যমন্দিরে গেছেন। সে-কথা শুনে আমি নাট্যমন্দিরে যাই। গিয়ে দেখি কঙ্কা শাস্তি কি শান্তি নাটকের জন্যে। মহলা দিচ্ছেন। খবর নিয়ে জানতে পারি সে-নাটকে তিনি ভুবনের চরিত্রে রূপদান করবেন।

প্রবোধ গুহর অপর সাক্ষী বিমলাপদ পাল একখানি এফিডেভিট দাখিল করলেন। সেযুগের নাট্য ও চিত্রজগতের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন টকী শো হাউস সিনেমাহলের মালিক এবং বায়োস্কোপ নামে একটি পত্রিকা তিনি চালাতেন। বিমলাপদ বললেন, আমি পাটের দালালি করি। এই মামলার অন্যতম প্রতিবাদী কঙ্কাবতী সাহুকে আমি ভালোভাবে চিনি। আমি জানি সে তার মায়ের পেশা অবলম্বন করেছে এবং তার নাম রঙ্গনটীদের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। মে মাসের শেষের দিকে কঙ্কাবতী একদিন আমাকে বলে সে ভীষণ অর্থাভাবে পড়েছে। আমি তাকে স্টার অথবা নাট্যমন্দিরে যোগ দেওয়ার পরামর্শ নিই। অবশ্য স্টার থিয়েটারকেই তার পছন্দ ছিল বেশি। স্টারের প্রতি এই কারণে তার বিশেষ দুর্বলতা ছিল যে তার মা সেখানেই অভিনেত্রী হিসেবে যুক্ত ছিল।

বিমলাপদ আরও বললেন, আমি খবর পেয়েছিলাম কঙ্কা স্টারেই যোগ দিয়েছে। এই মামলা রুজু হওয়ার কয়েক দিন আগে আমার কানে আসে সে নাট্যমন্দিরে যোগ দিতে চলেছে। একথা আমি শুনি নাট্যমন্দিরের অভিনেত্রী নলিনীবালার স্বামী বলে কথিত এক ভদ্রলোকের কাছে। সেই দিনই আমি কঙ্কার সঙ্গে দেখা করি। বলি, এ তুমি কি করতে চলেছ ? এমন কাজ কখনই কোরো না। সে আমাকে বলে, আমি শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে একটা লেখাপড়া করেছি। তিনি শাস্তি কি শান্তি নাটকে আমাকে ভুবনের চরিত্র দিয়েছেন। পরের নাটক নূরজাহানেও আমার প্রধান ভূমিকা থাকবে। বিমলাপদ পালের পর অপরেশ মুখোপাধ্যায় স্টারের হয়ে একটি হলফনামা দাখিল করলেন। নাট্যকার অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বললেন, কঙ্কাবতীর সঙ্গে প্রবোধ গুহর চুক্তি সম্পাদনের সময়ে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর শিশিরকুমার ভাদুড়ী আদালতে তাঁর দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন। তিনি সর্বসমক্ষে প্রবোধ গুহর মুখোস খুলে দিলেন ও প্রবোধ গুহর চরিত্র সম্বন্ধে নানা তথ্য মেলে ধরলেন। তিনি বললেন, থিয়েটারের সম্পর্কে আসার আগে প্রবোধ-চন্দ্র গুহ ডাক ও তার বিভাগে কেরানির কাজ করতেন। কোনো কারণে সেখান থেকে তাঁর চাকরি চলে যায়। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে যাওয়ার আগে তিনি সেই ব্যাঙ্ক থেকে চুরাশি হাজার টাকা ওভারড্রাফ্‌ট নিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে যোগসাজসে প্রবোধবাবু তাঁর অধীনস্থ বেশকিছু অভিনেত্রীর নামেও ওভারড্রাফ্‌ট নিয়েছিলেন। এমনকি তাঁর রক্ষিতা নীহারবালাকে দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন।

প্রবোধ গুহ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ শেষ করে আসল কথায় এলেন শিশির-কুমার। তিনি বললেন, গত মে মাসে স্টার থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টর কুমার-কৃষ্ণ মিত্রের মাধ্যমে আমার কাছে একটি প্রস্তাব আসে। সেটি স্টার ও নাট্যমন্দির দুটি থিয়েটারের সংযুক্তির প্রস্তাব। সে কথা শুনে আমি কুমারবাবুকে বলি যে, প্রবোধ গুহর আগের ইতিহাস সবই আমার জানা। সুতরাং আমি চাই থিয়ে-টারের টাকাকড়ির ব্যাপারে প্রবোধবাবুর কোনো সংশ্রব থাকবে না। যদি এমন ব্যবস্থায় রাজি থাকেন তাহলে আমাকে জানাবেন। বলা বাহুল্য, আমার সেই শর্তে তাঁরা পিছিয়ে যান। দুটি থিয়েটারের একত্রীকরণের প্রস্তাবটা বানচাল হয়ে যায়। সেই আক্রোশেই প্রবোধ গুহ আমাকে এই মামলায় জড়িয়েছেন।

শিশিরবাবু আরও বললেন, আমার থিয়েটারে নলিনীবালা নামে একজন অভিনেত্রী আছে। তারই মারফৎ কঙ্কাবতী আমার কাছে অভিনয় শেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমার সঙ্গে কঙ্কার কোনোরকম চুক্তি হয়েছে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

শিশির ভাদুড়ী এখানেই তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন। তাঁর সেক্রেটারি সনৎ কুমার মুখার্জি বললেন, শাস্তি কি শান্তি নাটকে কঙ্কাবতীকে কোনো চরিত্র দেওয়া হয়নি। সাধারণ রঙ্গালয়ে তার যোগদান করার ইচ্ছা ছিল। শিশিরবাবুর শিক্ষণ-পদ্ধতি দেখার জন্যই সে রিহার্সাল দেখতে আসত। নাট্যমন্দিরের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছে একথা মিথ্যা।

তার পরের জবানবন্দী মিস নলিনীবালার। তিনি ছিলেন নাট্যমন্দিরের শিল্পী। তিনি বললেন, এই মামলার দু'মাস আগে কঙ্কাবতী ভাড়াটিয়া হিসাবে তাঁর বাড়িতে আসে। কঙ্কাবতী তাঁর কাছে থিয়েটারে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং নাট্যগুরু হিসাবে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাম তার কাছে প্রস্তাব করে। নাট্যমন্দিরে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাও সে ব্যক্ত করে। জুন মাসের দু' তারিখে নলিনীবালা তাকে নাট্যমন্দিরে নিয়ে যান ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন। এর বেশি আর কিছু তিনি জানেন না। নলিনীবালা আরও বললেন, আমি বিমলাপদ পালকে চিনি যিনি এই মামলায় ইতিপূর্বে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। কঙ্কাবতীর ছোটো বোন চন্দ্রাবতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। চন্দ্রাবতীও এক সময়ে আমার ভাড়াটিয়া ছিল। কিছুকাল আগে একদিন সকালে প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় বিমলাপদ পালকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়ি আসেন এবং কঙ্কাবতীকে আর্ট থিয়েটার্সে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। কঙ্কা আমার সামনেই তাঁর সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

সবশেষে কঙ্কাবতীর পালা। আদালতে তিনি এক সুদীর্ঘ জবাব দাখিল করলেন। সে এক রিক্ততা আর বঞ্চনার আলেখ্য। ভাগ্যের পায়ে নিষ্ঠুর প্রাণ-ভিক্ষা না-যেচে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচাতে গিয়ে কী প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছিল একটি কুমারী হৃদয়কে, তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। কঙ্কাবতীর নিজের মুখে বলা সেই কাহিনী একান্ত ব্যক্তিগত যা কোনোদিন প্রকাশ্যে প্রচারিত হয়ে জনসাধা-রণের কাছে পৌঁছায়নি। সে-কাহিনী তিনি প্রকাশ করেছিলেন মামলার প্রয়োজনে, যা লুকিয়ে আছে আদালতের চার দেওয়ালের মাঝে নথিপত্রের স্তূপে। কঙ্কাবতী সেদিন হয়তো চোখের জলে বিবৃত করেছিলেন তাঁর জীবনের ভাঙাগড়ার কথা। গরলকে যে অমৃত বলে গ্রহণ করতে পারে সে তো অপাপবিদ্ধা!

কঙ্কাবতী বললেন, আমি বিহারের প্রসিদ্ধ ও সঙ্গতিসম্পন্ন জমিদার গদাধর সাহুর মেয়ে। আমার বাবা গানবাজনা ও অভিনয়ের মস্ত সমঝদার ছিলেন। কলকাতায় এসে একসময়ে তিনি স্টার থিয়েটারের তদানীন্তন নর্তকী ও গায়িকা অভিনেত্রী নলিনীবালার প্রতি আকৃষ্ট হন। তারপর নলিনীবালার সঙ্গে আমার বাবার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে আমার মা নলিনীবালা মারা গেছেন। বাবাকে তিনি ছ'টি সন্তান দিয়েছিলেন। আমরা দুই বোন এবং চার ভাই।

আদালতে তিলধারণের জায়গা ছিল না। রুদ্ধনিঃশ্বাসে সকলে শুনছিল কঙ্কা-বতীর কথা। সে যেন কোনো একটা নাটকের দৃশ্যাভিনয়। কঙ্কাবতী বললেন, বিহারের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী আমার মাকে বাবা কোনোদিন সামাজিক মর্যাদা দিতে পারেননি। নিজের সন্তান হিসাবে আমাদেরও তাঁর পরিবারে স্থান দিতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তবে আমাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যাপারে বাবা কোনোদিন কোনো ত্রুটি রাখেননি বা কার্পণ্য করেননি। আমরা অত্যন্ত সচ্ছলতায় প্রকৃত জমিদারের সন্তান হিসেবেই বেড়ে উঠেছিলাম।

তারপর আমাদের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ দেখা দিল। আমার মায়ের মৃত্যু হলো। মৃত্যু হলো আমাদের আশার, আমাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের। আমাদের প্রতি বাবার স্নেহ আস্তে আস্তে মুছে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত, আমাকে ও আমার বোনকে নিজেদের বাঁচার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হলো। ফলে আমরা আমাদের মায়ের পেশারই অনুগামিনী হলাম। ইতিমধ্যে আমার বাবাও চলে গেছেন ওপারের ডাকে।

উনিশ শ' ছাব্বিশ সালে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করি।

সামাজিক পরিবেশে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার আশায় আমি কোনো একটা চাকরির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করি। কিন্তু ব্যর্থ হই। কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। ছাত্রী অবস্থায় বেথুন কলেজের অনুষ্ঠানে আমি কয়েকবার অভিনয় করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত অভিনয় করে অর্থ উপার্জনের কথা আমি চিন্তা করলাম। সেই উদ্দেশ্যেই আমি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে পরিচিত হই। আমার ছোটো বোন চন্দ্রাবতীর সঙ্গে বিমলাপদ পালের পরিচয় আছে। বিমলাপদবাবু প্রবোধ গুহ মহাশয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওঁরা দুজনে আমার কাছে কয়েকবার এসেছিলেন এবং আমাকে আর্ট থিয়েটার্সে যোগ দেওয়ার জন্যে বার বার অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরা আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন যে জুন মাসেই নাট্যমন্দির আর্ট থিয়েটার্সের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং এইভাবেই তাঁরা আমার সম্মতি আদায় করেছিলেন। প্রবোধবাবু কৌশলে আমাকে দিয়ে একখানি চিঠি সই করিয়ে নেন। সেই চিঠির বয়ান ও বিষয়বস্তু আমি জানি না। বুঝতে পারছি সেই চিঠিখানাকেই প্রবোধবাবু সুযোগ বুঝে একটা চুক্তিপত্রের রূপ দিতে চান। এ ছাড়া জুন মাসের দশ তারিখে প্রবোধবাবু আমাকে তাঁর থিয়েটারে ডেকে নিয়ে গিয়ে কয়েকখানি কাগজে সই করিয়ে নেন।

উনিশ তারিখে কলকাতার রাজপথে আমার নামে স্টার থিয়েটারের পোস্টার দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। সেই সন্ধ্যায় প্রবোধবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, সাতাশ তারিখে আমাকে স্টেজে নামতে হবে। আমার শরীর অসুস্থ থাকায় আমি আমার অসম্মতি ও অক্ষমতা জানালাম। তখনও আমি জানতাম না যে আর্ট থিয়েটার্স ও নাট্যমন্দিরের সংযুক্তির ব্যাপারটা ভেস্তে গেছে। সেই কথাটা আমি প্রবোধবাবুর রক্ষিতা নীহারবালার কাছে জানতে পারি এবং স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের সংকল্প ত্যাগ করি।

নীহারবালা কঙ্কাবতীর কথার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। প্রবোধ গুহ কঙ্কাবতী ও শিশির ভাদুড়ীর জবানবন্দীর শেষে বললেন, দুটি থিয়েটার একত্রীকরণের গল্পটা নিছক কাল্পনিক।

জবানবন্দীর পর আদালতে তর্কযুদ্ধ শুরু হলো। দীর্ঘ সময় নিয়ে দু'পক্ষের আইনজীবীরা সওয়াল করলেন, কিন্তু বিচারপতি স্টার থিয়েটারের প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখালেন না। সেদিন সহানুভূতি কেড়ে নিয়েছিলেন কঙ্কাবতী। স্টার থিয়েটারকে একটা রফায় আসতে হলো। তার শর্ত হলো এইরকম— ১. জুন মাসের দশ তারিখে স্বাক্ষরিত আর্ট থিয়েটার্স ও কঙ্কাবতীর এগ্রিমেন্টটি বাতিল

বলে গণ্য হলো। কঙ্কাবতী আর কোনোক্রমেই সেই চুক্তিতে আবদ্ধ রইলেন না। ২. কঙ্কাবতী সাহু আগামী একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো পেশাদার রঙ্গালয়ে অভিনয় করতে পারবেন না। তবে ছায়াছবিতে তাঁর অভিনয়ের ব্যাপারে কোনো বাধা থাকবে না। ৩. একত্রিশে ডিসেম্বরের পর তিনি যদি কোনো পেশাদার রঙ্গালয়ে যোগ দেন তাহলে পনেরো তারিখের আগে তাঁর যোগদান সম্পর্কিত সংবাদ পোস্টার বা সংবাদপত্র মারফৎ জানানো যাবে না। বাদী ও প্রতিবাদী মামলার নিজ নিজ খরচ বহন করবেন।

মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে কঙ্কাবতী আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন। আদালতের নির্দেশিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি নাট্যমন্দিরে যোগ দিয়েছিলেন। নিজেকে শিশিরকুমারের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন আরও অন্তরঙ্গভাবে। কালে তিনি শিশিরকুমারের জীবনসঙ্গিনী হয়েছিলেন।

আবার মিনার্ভার কথায় ফিরে আসি। আগেই বলেছি বাইশ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে আগুন লাগার পর পুড়ে যাওয়া রঙ্গালয়টি পুনর্বিন্যাস করতে দীর্ঘ তিনটি বছর সময় লেগেছিল। প্রভূত ক্ষতির বোঝা মাথায় নিয়ে সেই তিনটি বছর উপেন্দ্র মিত্রকে ভাগ্যের সঙ্গে ভীষণ লড়াই করতে হয়েছিল। তার ওপরে ছিল মামলা-মোকদ্দমার খরচ। ফলে উপেন্দ্র মিত্র অত্যন্ত আর্থিক সঙ্কটে পড়লেন। বাজার থেকে টাকা ধার করে তিনি থিয়েটার-বাড়ি মেরামতের কাজ শেষ করেছিলেন। ধার করে ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া তাঁর সামনে আর অন্য পথ খোলা ছিল না। ভেবেছিলেন থিয়েটার জমলে টাকা ঠিক শোধ হয়ে যাবে। সত্যিই, থিয়েটার চালু হওয়ার পর দর্শকের কোনো অভাব হয়নি। আশার আলো দেখে উপেন্দ্র মিত্র আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ছাব্বিশ সালের দাঙ্গায় ব্যবসা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তারপর থিয়েটারের ভাঙা হাটে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হাজির হয়েছিল নির্বাক বায়োস্কোপ। থিয়েটারের দর্শক সংখ্যা বেশ কমে গেল। দুঃসময়ে উপেন্দ্র মিত্র যাদের কাছে টাকা নিয়েছিলেন, শোধ দেওয়ার ব্যাপারে কথা রাখতে পারলেন না। তার ফলে মামলা।

কলকাতার গোপালচন্দ্র লেনের কোনো-এক সত্যব্রত সেন উনিশ শ' পঁচিশ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে উপেন্দ্র মিত্রকে তিন দফায় সাড়ে চার হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। তার মধ্যে এক হাজার টাকা তিনি ফেরত পেয়েছিলেন। বাকি সাড়ে তিন হাজার টাকার জন্যে তিনি উপেন্দ্র মিত্রের নামে নালিশ জুড়ে

দিলেন। সত্যব্রত তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। খুব আঘাত পেলেন উপেন্দ্র মিত্র, দাবীর সম্পূর্ণ টাকা তিনি পরিশোধ করে দিলেন। সত্যব্রত মামলা তুলে নিলেন।

উনিশ শ' আটাশ সাল উপেন্দ্র মিত্রের কাছে দুর্ভাগ্যের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছিল। মামলা দায়ের করল উদয়চাঁদ দাগা নামে একজন ডাকসাইটে মহাজন। ইতিমধ্যে তিনি আরও একটা মামলা দায়ের করেছিলেন। দু'টি মামলার দাবীর পরিমাণ আট হাজার টাকা। সমন পেয়ে উপেন্দ্র মিত্র অবাক হয়ে গেলেন এবং দুঃখও পেলেন। ব্যবসার প্রয়োজনে টাকার লোভে মানুষ এত ছোটো হতে পারে—একথা ভেবে তাঁর মনটা দমে গেল। যাই হোক, আদালতে এসে তিনি উদয়চাঁদের অভিযোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, ব্যবসাসূত্রে উদয়চাঁদের সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের পরিচয়। তিন বছর ধরে দুজনের লেনদেন চলছে। উদয়চাঁদের সঙ্গে তাঁর কথা ছিল থিয়েটারের প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত লগ্নী করবেন। দেওয়া-নেওয়ার কারবার চলছিল। টাকার লেনদেন হতো হুণ্ডিতে। সই করতেন উপেন্দ্র মিত্র এবং গ্যারাণ্টার হিসেবে তাঁর ভাইপো শিশিরকুমার মিত্র। টাকার নিরাপত্তার জন্যে উদয়চাঁদ যোগ্য সিকিউরিটি দাবী করেছিলেন। সিকিউরিটি হিসাবে শিশির মিত্র একটি ফ্লাট মেশিন, দুটি হাফক্রাউন মেসিন ও একটি হ্যাণ্ড প্রুফ মেশিন উদয়চাঁদের অনুকূলে বণ্ড দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর টাকার নিরাপত্তার কোনো প্রশ্ন নেই।

উপেন্দ্র মিত্র আদালতকে আরও বললেন, উদয়চাঁদ যেমন দফায় দফায় বহুবার টাকা দিয়েছেন, তেমনি তাঁকেও বহুবার আসল টাকা সুদ সমেত শোধ দেওয়া হয়েছে। থিয়েটারের দুঃসময়ের জন্যে অবশ্যই কিছু টাকা বাকি পড়েছে যা আগেই দেওয়ার কথা ছিল। উপেন্দ্র মিত্রের হিসাব অনুযায়ী পাওনা টাকার পরিমাণ আট হাজার টাকার তো নয়ই বরং তার চেয়ে ঢের কম। তিনি আদালতের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করে তাঁর জবাব শেষ করলেন।

শুনানী শুরু হলো। উদয়চাঁদের সঙ্গে তিন বছরের লেনদেনের হিসেব সম্পর্কিত খাতাপত্র তিনি আদালতে দাখিল করলেন। তাছাড়া তিনি বললেন, সরল বিশ্বাসে তিনি উদয়চাঁদকে আরও অনেক টাকা দিয়েছেন। সেসব টাকার রসিদ পাননি। আদালতে দাঁড়িয়ে উদয়চাঁদ তা অস্বীকার করলেন এবং টাকা নিয়ে রসিদ না-দেওয়ার কথা মানলেন না। উপেন্দ্র মিত্রের দুর্ভাগ্য। বিচারকও নিরুপায়। কাগজপত্রের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই তাঁর। হিসাবের খাতা পরীক্ষা করে দেখা গেল উদয়চাঁদের পাওনা ছ' হাজারের বেশি নয়। দু'টি মামলায় পাওনা ধার্য হলো

সাড়ে ছ' হাজার। দু'পক্ষের সম্মতিতে একটা সোলেনামা দাখিল হলো। ডিক্রির তারিখের তিন দিনের মধ্যে উদয়চাঁদকে পাঁচ শ' টাকা দিতে হবে। পরবর্তী এক পক্ষ কালের মধ্যে দিতে হবে আরও এক হাজার টাকা। তারপর প্রতি ছ' মাস অন্তর এক হাজার হিসাবে দিয়ে যেতে হবে যতদিন-না সম্পূর্ণ টাকা শোধ হয়। আপসনামা সই হলো উনিশ শ' আটাশ সালের আঠারো মে। একটা বড়ো রকমের দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেলেন উপেন্দ্র মিত্র। আদালত থেকে ফিরে এসে থিয়েটারে মন দিলেন।

চরম দুর্দিনের মাঝে উপেন্দ্র মিত্রের মাথায় একটা ভারি দেনার বোঝা চেপে গেল। যেটা একেবারেই বাধ্যতামূলক দেয়। কিন্তু এই রফা মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁর কোনো উপায়ও ছিল না। তাঁকে থিয়েটার চালাতে হবে। বাঁচতে হবে। থিয়েটারকে বাঁচাতে হবে। থিয়েটার তাঁর প্রাণ। কিন্তু মাত্র দুটো মাস শান্তিতে থাকার পর মিনার্ভার ভিত আবার টলে উঠল। আবার উপেন্দ্র মিত্রকে হাইকোর্টে ছুটতে হলো। নতুন মামলা। নতুন অভিযোগ। দাবী দশ হাজার টাকা। মামলা দায়ের করেছেন শ্রীমতী নির্মলনলিনী দেবী ও চণ্ডীচরণ পালিত। উত্তর কলকাতার জগদীশনাথ রায় লেনে থাকতেন কোনো-এক কালীনাথ পালিত। উপেনবাবুর বন্ধু-স্থানীয়। দশ হাজার টাকার প্রমিসরি নোট লিখিয়ে নিয়ে তিনি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। অন্য জায়গা থেকে টাকা সংগ্রহ করে তিনমাস পরে তিনি কালীনাথের টাকা সুদে-আসলে ফেরত দেবেন এইরকম একটা কথা ছিল। উপেন্দ্র মিত্র কথা রাখতে পারেননি। ইতিমধ্যে সাতাশ সালের জানুয়ারিতে কালীনাথ মারা যান। তাঁর জীবদ্দশায় সুদ বাবদ তিনি প্রায় আড়াই হাজার টাকা পেয়েছিলেন। কালীনাথের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী নির্মলনলিনী ও তিন ছেলে চণ্ডীচরণ, সন্তোষ ও সুভাষ অসহায় হয়ে পড়লেন। টাকার জন্যে মামলা করা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না।

আদালতে হাজির হয়ে উপেন্দ্র মিত্র বললেন, কালীনাথের কাছে দশ হাজার টাকা তিনি ধার নিয়েছিলেন একথা সত্যি। কিন্তু এটা সত্যি নয় যে সম্পূর্ণ টাকাটাই তাঁর পাওনা আছে। কালীনাথের জীবদ্দশায় সুদ ছাড়া আসল টাকার প্রায় অর্ধেক তিনি শোধ করেছিলেন। প্রতিকূল ভাগ্যের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে সবটা দিতে পারেননি। আদালতে তিনি হিসাবের খাতাপত্র জমা দিলেন।

দু'পক্ষের সওয়াল জবাবের পর বিচারপতি বাকল্যাণ্ডের এজলাসে এই মামলার ইতি হলো। দু'পক্ষের সই করা একটি সোলেনামায় দেয় টাকার পরিমাণ ঠিক হলো।

পাঁচ হাজার সাত শ' নয়। উপেন্দ্র মিত্র মাসে এক শ' তিয়াত্তর টাকা হিসাবে দেনা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। এই মামলায় নির্মলনলিনীর যাবতীয় খরচ এক মাসের মধ্যে তাঁকে দিতে হবে। চুক্তি মেনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন উপেন্দ্র মিত্র। মিনার্ভা তখনও চলছে স্বমহিমায় এবং সগৌরবে।

ওদিকে প্রবোধচন্দ্র গুহ ও অনাদিনাথ বসুর দ্বৈত ব্যবস্থাপনায় মনমোহন থিয়েটার বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। মনমোহনের মুখ্য শিল্পী তখন দানীবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়। মণিলাল বন্দোপাধ্যায়ের জাহাঙ্গীর নাটক খোলা হলো। নামভূমিকায় দানীবাবু, সাজাহান নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও যশোবন্ত সিংহ দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়। সে-সময়ে এক তরুণ প্রতিশ্রুতিবান নাট্যকারের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম মন্মথ রায়। তাঁর লেখা গীতিনাট্য মহুয়া অভিনীত হলো। নামভূমিকায় নবাগতা সরযূবালা ও নদেরচাঁদের চরিত্রে দুর্গাদাস হৈ-চৈ ফেলে দিলেন। মনমোহনের শিল্পী-তালিকায় সে সময়ে যুক্ত হয়েছিলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নিভাননী ও সুশীলাসুন্দরী।

সেই সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলো। আত্মদানে এগিয়ে এল দেশের ছেলেরা। দিন বদলাচ্ছে। শিল্প-সাহিত্য-নাটকের ক্ষেত্রেও আসছে পরিবর্তনের জোয়ার। নবাগত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত উপহার দিলেন দেশাত্মবোধক নাটক গৈরিক পতাকা। নাট্যকার রাতারাতি প্রতিষ্ঠা পেলেন। মনমোহন থিয়েটারে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বিরামহীন অভিনয় চলতে লাগল। সে-নাটকে শিবাজির চরিত্রে ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, আওরঙজেব রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, জিজাবাঈ সুশীলাসুন্দরী, মীরাবাঈ নীহারবালা। তা সত্বেও অন্তঃকলহে মনমোহন থিয়েটার টলে উঠল। শিল্পীরা নিয়মিত মাইনে পান না। কয়েকমাসের বাড়ি ভাড়াও বাকি পড়েছে। বেগতিক দেখে তিরিশ সালের নভেম্বর মাসে মনমোহন পাঁড়ে নালিশ করে দিলেন। হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, প্রবোধ গুহ চারদিক থেকে দেনায় জড়িয়ে আছেন। বকেয়া সমস্ত ভাড়া যদি এখনি আদায় না হয় তাহলে সব টাকাটাই জলে পড়বে। তার জবাবে প্রবোধ গুহ বললেন, নতুন রাস্তা তৈরির জন্যে ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন কালেক্টর থিয়েটার-বাড়ি ছাড়ার নোটিশ জারি করেছে। মনমোহন পাঁড়ে কালেক্টরের কাছে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করেছেন। লীজের শর্ত অনুযায়ী প্রবোধ গুহর মেয়াদ শেষ হতে এখনও তিনবছর বাকি। যদি থিয়েটার-বাড়ি

সরকার দখল করে তাহলে মনমোহনবাবু যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ পাবেন। সেক্ষেত্রে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হবেন প্রবোধবাবু নিজে। সে প্রশ্নটা তিনি আদালতকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার প্রার্থনা জানালেন।

মনমোহন পাঁড়ে বললেন, একথা ঠিক যে নগর উন্নয়নের প্রয়োজনে থিয়েটার-বাড়ির দখল ছেড়ে দিতে হবে। প্রবোধ গুহর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়নি সে কথাও সত্যি। বাড়ি যখন সরকার অধিকার করে নিচ্ছে তখন তাতে কারো হাত নেই। সেজন্যে পাওনা বকেয়া ভাড়া থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন কেন? বিচারপতি প্যাংক্রীজের কাছে মামলার শুনানী হলো। জজসাহেব আদেশ দিলেন প্রবোধ গুহ আপাতত পাঁচ হাজার টাকা আদালতে জমা দিলে তবেই মামলা লড়তে পারবেন।

প্রবোধ গুহর সৌভাগ্য-সূর্য তখন অস্তাচলগামী। অন্য মামলাতেও তিনি ব্যতি-ব্যস্ত। স্টার থিয়েটারের নামে কারনানি ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক মামলা করেছে। সে-মামলা চালাতেও প্রচুর খরচ। এই অবস্থায় নগদ পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়ে মামলা লড়ার কোনো মানে হয় না। আশাভঙ্গের আঘাতে আর আসন্ন দুঃসময়ের চিন্তায় তিনি তখন দিশাহারা। নাট্যজগতের রসগ্রাহী দর্শকের কাছে তিনি তখন এক রিক্ত, নিঃস্ব প্রয়োগকর্তা।

তবুও সেই অবস্থায় তিনি এক নতুন পরীক্ষায় নামলেন। একত্রিশ সালের চব্বিশে মার্চ তিনি অনাদি বসুর নামে হাইকোর্টে মামলা করলেন পাঁচ হাজার এক শ' টাকার দাবী জানিয়ে। প্রবোধ গুহর টাকা আদায়ের ফন্দি দেখে অনাদি বসু হাসলেন। পাকাপোক্তভাবে তিনি লেনদেনের হিসেব রেখেছিলেন। তাঁর খাতাপত্র একথা বলে না যে প্রবোধ গুহর কাছে তিনি ঋণী। কোর্টে এসে তিনি হিসাবের খাতাপত্র দাখিল করলেন। পাওনা-গণ্ডার হিসাব খতিয়ে দেখার জন্যে বিচারপতি কুমারকৃষ্ণ মিত্রকে আরবিট্রেটর নিযুক্ত করলেন। দু'মাস পরে কুমারকৃষ্ণ আদালতকে তাঁর মতামত জানালেন। অনাদি বসু আর্ট থিয়েটার্স'কে মোট পাঁচ শ' টাকা দেবেন। আপস মীমাংসার ব্যয়ভারও তিনি বহন করবেন। আদালত সেই অভিমতই বহাল রাখল।

তার পরে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট অধিকার করে নিল সেই ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চ মনমোহন থিয়েটারের বাড়িটা। বহুজন-স্পর্শধন্য থিয়েটার-বাড়িটা ভাঙা শুরু হলো। সেই বাড়িতে স্টার থিয়েটারের সূচনা। তারপর নাম বদলে, সাজ বদলে এমারেল্ড, ক্লাসিক, কোহিনুর। আর নয় নুপুরের নিক্কণ। শত শত মজদুর শাবল দিয়ে ভেঙে ফেলল সাজঘর, মঞ্চ আর অলিন্দ। কলকাতা কর্পোরেশনের খাতা

থেকে সেদিন একটা নম্বর মুছে গেল। আটষট্টির বি, বিডন স্ট্রিট। যন্ত্রদানব স্টীমরোলার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল সেই স্বপ্নপুরীকে। নিশ্চিহ্ন প্রমোদপুরীর ওপর দিয়ে প্রসারিত হলো এক নতুন প্রশস্ত রাজপথ। কালের গর্ভে হারিয়ে গেল মনমোহন থিয়েটার। তার স্থান এখন ইতিহাসের পাতায় আর স্মৃতির মণিকোঠায়।

আইনের চাপে পড়ে অহীন্দ্র চৌধুরী স্টার থিয়েটারে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁকে মূলধন করে স্টার বিপুল টাকা আয় করেছিল। মনের মিল না-থাকলেও অহীন্দ্র অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে কাজ করে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর কাজের মেয়াদের শেষ দিন ছিল তিরিশ সালের তেরো এপ্রিল। তার একমাস আগে তিনি স্টার থিয়েটারকে লিখিত নোটিশ দিলেন :

মেসার্স আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড (স্টার থিয়েটার)
৭৯/৩/৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট,
কলিকাতা।

মহাশয়,
এই মর্মে আমি আপনাদের জানাইতেছি যে আদালতের ডিক্রির শর্ত অনুযায়ী ১৯৩০ সালের ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত আপনাদের রঙ্গালয়ের অভিনেতা হিসাবে কাজ করিব। ১৪ই এপ্রিল হইতে আমি আর আপনাদের অধীনে কাজ করিব না। আমি অন্যত্র মঞ্চাবতরণ করিব।

ইতি—
অহীন্দ্রভূষণ চৌধুরী

এই চিঠি পেয়ে স্টার থিয়েটার এ-নিয়ে কোনো আলোচনায় এল না। তেরো এপ্রিল সকালে অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভা থিয়েটারের উপেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন। সেই রাত্রেই স্টারের কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসেছিলেন অন্যতম ডিরেক্টর অ্যাটর্নি সতীশচন্দ্র সেন। অহীন্দ্র আসন গ্রহণ করার পর সতীশচন্দ্র সেন আদালতের পূর্বতন ডিক্রির শর্ত অনুযায়ী তাঁর কাছে ক্ষতিপূরণের টাকা ও মামলার খরচ চাইলেন। বললেন, অহীন্দ্র যদি অবিলম্বে সেই টাকা না-দেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করা হবে।

এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনে অবাক হলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। আর্ট থিয়েটার্সের সম্বন্ধে তাঁর মনটা ঘৃণায় ভরে গেল। মনে পড়ল তিন বছর আগের কথা। তখন স্টার থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর মামলা চলছে। একদিন প্রবোধ গুহ ও দুর্গাদাস

ব্যানার্জি তাঁকে অনুরোধ করলেন ঝগড়া-বিবাদ-মামলা-মোকদ্দমা ভুলে আবার স্টারে ফিরে আসতে। তাঁদের এই প্রস্তাবের সময়ে সেখানে গ্লোব থিয়েটারের ম্যানেজার হেমচন্দ্র ব্যানার্জি এবং ম্যাডান কোম্পানীর জে. সি. ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন। তারপর প্রবোধ গুহ ও দুর্গাদাস তাঁকে একদিন গদাধর মল্লিকের যশোর রোডের বাগানবাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে অভিনেতা অপরেশ মুখোপাধ্যায় ও স্টারের অংশীদার অরুণপ্রকাশ বড়াল উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাঁকে আবার স্টারে অভিনয় করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাঁরা সেদিন আশ্বাস দিয়েছিলেন অত্যন্ত সুবিধাজনক শর্তে তাঁরা আদালতের চলতি মামলাটা মিটিয়ে নেবেন। শুধুমাত্র সম্মানের খাতিরে খুব সামান্য টাকার ডিক্রি নেবেন। এবং সেই ডিক্রির টাকা কোনোদিনই তাঁরা আদায় করবেন না এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

তাঁদের কথায় সেদিন বিশ্বাস করে আপসনামায় স্বাক্ষর দিয়ে অহীন্দ্র আবার স্টার থিয়েটারে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু সতীশচন্দ্র সেনের মুখে এতদিন পরে ডিক্রি জারির কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। কোনো জবাব না-দিয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তিনি ফিরে এলেন। পরের দিনই স্টার থিয়েটার আইনের আশ্রয় নিল। তারা অ্যাটর্নির চিঠি দিল। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অহীন্দ্র যদি ডিক্রির টাকা না দেন তাহলে ডিক্রি জারি করা হবে।

অহীন্দ্র চৌধুরীর হয়ে অ্যাটর্নি পান্নালাল দে সেই চিঠির জবাব দিলেন। চিঠির উত্তরে বলা হলো, অহীন্দ্র পরবর্তী তিন বছরের মেয়াদে স্টারে অভিনয় করবেন অঙ্গীকার করায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মৌখিক বন্দোবস্ত হয়েছিল ডিক্রি কোনোদিন জারি হবে না। স্টার অহীন্দ্রর অ্যাটর্নির চিঠির কোনো গুরুত্ব দিল না। মে মাসের আট তারিখে তারা ডিক্রি জারি করল। ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচ শ' টাকা ও মামলার খরচ সহস্রাধিক না মিটিয়ে দিলে অহীন্দ্রর সম্পত্তি ক্রোক করা হবে।

স্টারে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সম্পর্কটা এক চরম তিক্ততার শেষ সীমানায় পৌঁছেছিল একথা অহীন্দ্র চৌধুরী জানতেন। তাদের এই অন্যায় জুলুম তিনি মেনে নিতে পারলেন না। তিনি কি স্টারের কেনা গোলাম হয়েই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন ? আইনবিদের পরামর্শে মে মাসের কুড়ি তারিখে তিনি স্টারের নামে হাই-কোর্টে মামলা দায়ের করলেন। সমস্ত ঘটনা তিনি তুলে ধরলেন আদালতের সামনে। বললেন, হীন ষড়যন্ত্র-প্রসূত এই ডিক্রি যদি জারি করা হয় তাহলে তাঁর সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে যাবে। তাঁকে নিয়ে স্টার থিয়েটার এক সর্বনাশা খেলায় মেতেছে।

অহীন্দ্র এতদূর এগোবেন স্টার আশা করতে পারেনি। তারা ভেবেছিল অহীন্দ্র ভয় পেয়ে আবার স্টারে ফিরে আসবেন। তাদের ধারণা যখন ভুল হলো, তখন আদালতে এসে বিরোধিতা করা ছাড়া উপায় নেই। থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টর অ্যাটর্নি সতীশচন্দ্র সেন এফিডেভিট দাখিল করলেন। তিনি বললেন, তিন বছর আগে স্টারের সঙ্গে চুক্তি বলবৎ অবস্থায় অহীন্দ্র মিত্র থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর নামে নালিশ হয়েছিল। অহীন্দ্র শেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং আবার স্টারে ফিরে এসেছিলেন। মামলা মিটমাটের শর্ত অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের টাকা এবং মামলার খরচ তিনি থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁকে কোনোদিনই এমন আশ্বাস দেওয়া হয়নি যে, সে টাকা কখনো আদায় করা হবে না। সতীশ সেন আরও বললেন গত তিন বছরে স্টার থিয়েটার বেশ কয়েকবার তাঁর কাছে ডিক্রির টাকা দাবী করে। কিন্তু প্রতিবারই অহীন্দ্র আর্থিক অনটনের অজুহাতে সময় নেন। তারপর তাঁর পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি আরও অর্থকষ্টে পড়েন এবং আরও সময় চান। অহীন্দ্রর আর্থিক অবস্থার কথা সর্বজনবিদিত। ডিক্রি জারি করা হলে তাঁর সম্মানের কোনো ক্ষতি হবে না। তাছাড়া অহীন্দ্র চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে সতীশ সেনের কাছে ঋণী। প্রয়োজনে তাঁর স্বাক্ষরিত কাগজপত্র তিনি আদালতে দেখাতে পারেন।

সতীশচন্দ্র সেনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে অহীন্দ্র চৌধুরী একটি এফিডেভিট শপথ করলেন। মামলার গভীরে যাওয়ার কোনোরকম চেষ্টা তিনি করেননি। তিনি বললেন, আমি একজন সাধারণ শিক্ষিত লোক। ইংরাজি ভাষা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আইনের জ্ঞান তো আমার মোটেই নেই। আমাকে দিয়ে সতীশচন্দ্র সেন যদি কিছু লিখিয়ে নিয়ে থাকেন তাহলে সেটা তাঁর হীনতারই পরিচায়ক। তাহলে বুঝতে হবে অসৎ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এক স্বল্পশিক্ষিত লোকের কাছ থেকে তিনি সুযোগ নিয়েছেন। আমি এ-বিষয়ে আদালতের কাছে আমার নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

সম্মানের যুদ্ধ ক্রমে প্রবল রূপ নিল। দু'পক্ষের কৌঁসুলীর তর্ক-বিতর্কে মামলার জটিলতা ক্রমশ বাড়তে লাগল। শেষে রঙ্গজগতের কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের মধ্যস্থতায় তিরিশ সালের বিশ জুন তারিখে এই মামলার শেষ হলো। সতীশ-চন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথা বলার জন্যে অহীন্দ্র চৌধুরী আদালতে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইলেন। নিজের আর্থিক দুরবস্থার কথা তিনি আদালতে ব্যক্ত করলেন। সে-কথা মেনে নিয়ে স্টার থিয়েটার মোট আট শ' টাকার ডিক্রি নিতে রাজি

হলো। মামলায় খরচ কেউ কাউকে দেবে না। মাসিক এক শ' টাকা হিসাবে অহীন্দ্র চৌধুরী এই ডিক্রির টাকা শোধ করবেন।

শান্তিপূর্ণভাবে মামলাটা নিষ্পত্তি হওয়ায় অহীন্দ্র চৌধুরী একটা মস্ত বড়ো ঝামেলা থেকে মুক্তি পেলেন। উপেন্দ্র মিত্রের কাছে শুরু করলেন তাঁর জন-অভিনন্দিত নাট্যজীবনের আর-এক অধ্যায়। দর্শক সমাগমে মুখর হয়ে উঠল মিনার্ভা থিয়েটার। অহীন্দ্র চৌধুরী তখন এক জনচিত্তজয়ী নট।

উনিশ শ' তিরিশ সালের চোদ্দ মার্চ দোলপূর্ণিমার রাত্রে নাট্যমন্দিরের আয়ু ফুরিয়ে গেলো। শিশিরকুমার ভাদুড়ী সাধারণ রঙ্গালয় থেকে সাময়িকভাবে বিদায় নিলেন। সে রাত্রে নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয়েছিল শঙ্খধ্বনি নাটক ও বসন্তলীলা গীতাভিনয়। অভিনয়-শেষে মঞ্চে দাঁড়িয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী আবেগরুদ্ধ এক ভাষণ দিয়েছিলেন :

> বাংলা দেশের নট এতদিন কল্পনা করিয়াছিল যে বাংলার নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য বঙ্গবাসীর নিকটে সে সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত করিবে। সেই প্রচেষ্টা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল নাট্য মন্দিরে। নাট্য মন্দিরের অভ্যুদয় যে প্রাণবন্ত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ বাংলার নাট্যানুরাগী দর্শকদের নাট্য মন্দিরে অভিনয় দর্শন করিবার একান্ত ব্যাকুলতা। কিন্তু কলালক্ষ্মীর চরণে উদ্দিষ্ট অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করিলেও, ব্যবসায় হিসাবে কি কারণে তাহার সাফল্য ঘটিল না তাহা প্রকাশ করিতে নিবৃত্ত রহিলাম। নাট্য মন্দিরের দেউল আজ ভিত্তিহীন। নটরাজের পূজারীরা আজ আশ্রয়হীন। অভিযোগ করিতে চাহি না। ব্যঙ্গোক্তি, বক্রোক্তি, অপমান মাথায় পাতিয়া লইতেছি। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ হইতে শেষ বিদায় লইবার পূর্বে দুই একটা কথা বলিয়া যাইতে চাই। বাংলার নাটক ভবিষ্যতে কী রূপ ধারণ করিবে তাহারই অনুসন্ধান-প্রচেষ্টায় নাট্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইবার পূর্বেই ব্যর্থতায় তাহার পরিসমাপ্তি হইল। ধনিকের অত্যাচার, কূটবুদ্ধি প্রতিদ্বন্দ্বীর ষড়যন্ত্র, শিক্ষাভিমানীর ঔদাসীন্য, অশিক্ষিতের অনাগ্রহ, কপট বন্ধুর অনুতাচার, স্বার্থান্বেষী প্রিয়জনের আত্মীয়তা কর্ণবধের ন্যায় এই দরিদ্র নটগণের পুজা পণ্ড করিল। এখন আপদ্ধর্ম অবলম্বন করিয়া নাট্য মন্দিরের নতুন জীবনের আশায় আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়াসকে অনেকেই উপহাস করিতেছেন এই হেতু যে, আমরা আমাদের নটনীতি বিসর্জন দিয়া স্বৈরাচার করিতেছি। এ কথা মিথ্যা।

বর্তমান যে রঙ্গালয়ের সঙ্গে নাট্য মন্দিরের উপাসকগণ সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা শুধু এই কারণেই অল্পকালের জন্য আংশিকভাবে তাঁহাদের মত ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন যে, অভাব ও অবহেলার মেঘ অন্তর্হিত হইবার পর তাঁহারা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবেন। এই মেঘাচ্ছন্ন কালের মেয়াদ মাত্র দুই মাস। তাহার পরের ঘটনা যদি আমাদের বিড়ম্বিত করে, তাহা হইলে সেই অগৌরব যেন নাট্য মন্দিরের সেবকদেরই স্পর্শে।

দোলপূর্ণিমার সেই রাত্রে আবিরে রাঙা হয়ে উঠেছিল থিয়েটার হল। সেই সঙ্গে দর্শকদের চোখের জল। শিশিরকুমারও কান্না চেপে রাখতে পারেননি। তিনি তখন এক পরাজিত সম্রাট।

সেই নিদারুণ সংকটের দিনেও শিশিরকুমার শান্তিতে কাল কাটাতে পারলেন না। বাধা আর বিপত্তি, অশান্তি আর উদ্বেগ তাঁকে জড়িয়ে রেখেছিল। যেখানে গেছেন পেছনে গেছে অদৃষ্ট। নাট্যমন্দির বন্ধ হওয়ার কয়েকদিন পরেই তিনি অ্যাটর্নি পান্নালাল দে'র কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। অভিনেত্রী চারুশীলার পক্ষে লেখা সেই চিঠিখানির মর্ম :

আপনি আমার মক্কেলকে তার পাওনা বেতন দিতে অবহেলা করেছেন ও অক্ষম হয়েছেন। সেই কারণে তার সঙ্গে আপনার যে চুক্তি ছিল তা ভেঙে গেছে এবং তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আমার মক্কেল ইতিমধ্যেই মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এতদ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করা যাচ্ছে যে, আগামীকাল ৩০শে এপ্রিল থেকে সে মিনার্ভায় মঞ্চাবতরণ করবে।

সেই চিঠির শেষে চারুশীলার বকেয়া বেতন দু'হাজার এক শ' অষ্টআশি টাকা দাবী করা হয়েছিল এবং যা তিনদিনের মধ্যে না-দিলে আদালতের আশ্রয় নেওয়া হবে।

চিঠি পেয়ে শিশির ভাদুড়ী তার জবাব দিলেন। তিনি বললেন, চারুশীলার টাকার দাবীটা হিসাব-সাপেক্ষ। তার যদি কিছু পাওনা থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে অন্য থিয়েটারে তার যোগ দেওয়ার অধিকার নেই। আঠারো অক্টোবর তার মেয়াদ শেষ হবে।

পয়লা মে তারিখে চারুশীলা শিশিরকুমারের নামে হাইকোর্টে নালিশ করলেন। বললেন, নাট্যমন্দির বন্ধ হওয়ার দিন পর্যন্ত তিনি শিশিরকুমারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভাদুড়ী মশাই তাঁকে বলেছিলেন অর্থাভাবে তিনি থিয়েটার থেকে

বিদায় নিচ্ছেন। মৌখিকভাবে পয়লা এপ্রিল থেকে তিনি তাঁকে জবাব দিয়েছিলেন এবং অন্য জায়গায় কাজ খুঁজে নিতে বলেছিলেন। সেই কথামতো চারুশীলা মাসে তিন শ' টাকা মাইনেতে মিনার্ভায় যোগ দিয়েছেন। আর্জিতে চারুশীলা আরও বলেছিলেন শিশিরকুমারের আর্থিক অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন এবং তা দেউলিয়ারই অনুরূপ। চারুশীলাকে তিনি আজ পর্যন্ত বকেয়া বেতন দিতে পারেননি। টাকা এখনি না-পেলে ভবিষ্যতে আদায়ের সম্ভাবনা থাকবে না।

চারুশীলা মামলা ফাইল করার পরের দিন শিশির ভাদুড়ীও হাইকোর্টে একটা পাল্টা মামলা দায়ের করলেন। সে-মামলার বিপক্ষ অভিনেত্রী চারুশীলা দাসী ও মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রকুমার মিত্র। শিশিরবাবুর অভি-যোগ, তাঁর সঙ্গে চুক্তি বলবৎ থাকাকালে চারুশীলার মিনার্ভায় যোগদান ঘোরতর অপরাধজনক কাজ। এই কারণে তিনি চারুশীলা ও উপেন্দ্র মিত্রের কাছে পনেরো হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ চাইলেন। আদালতের কাছে প্রার্থনা জানালেন তাঁর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত মিনার্ভায় অভিনয় করার ব্যাপারে চারুশীলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক।

কয়েকদিন পরে চারুশীলার আনা মামলার অভিযোগের জবাব দিলেন শিশির-কুমার। তিনি বললেন, চারুশীলা তাঁর কাছে তিন বছরের মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ ছিল। চুক্তি অনুযায়ী নাট্যমন্দির অথবা যে-কোনো থিয়েটারে বা যে-কোনো স্থানে শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত যে-কোনো নাটকে সে অভিনয় করতে বাধ্য থাকবে। অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে একটি ছিল:

> চুক্তি অনুযায়ী যতদিন আমি আপনার কাজে নিযুক্ত থাকব ততদিন আপনার লিখিত অনুমতি ব্যতীত অভিনয়ে অথবা মহলায় আমি অনুপস্থিত থাকব না। যদি আমি অসুস্থতা নিবন্ধন কোনদিন অনুপস্থিত হই তাহলে শারীরিক অসুস্থতার প্রমাণ স্বরূপ আমি চিকিৎসকের সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য থাকব। ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির জন্য আপনার থিয়েটারের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শাস্তি পেতে আমি বাধ্য থাকব।

শিশিরকুমার বললেন, উপরোক্ত শর্ত অবহেলা করে চারুশীলা অন্য থিয়েটারে অংশগ্রহণ করেছে। এ-বিষয়ে তাঁর কাছে যা ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয়েছে তা আদালতের বিবেচ্য।

এবারে চারুশীলার পালা। শিশির ভাদুড়ীর প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে চারুশীলা বললেন, নাট্যমন্দির বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিটার আর কোনো

দাম নেই। বকেয়া টাকা না-দেওয়ার ফন্দি এঁটে শিশিরকুমার পাল্টা মামলা এনেছেন এবং নানারকম কথা বলেছেন। শিশিরবাবু দেনায় আকণ্ঠ ডুবে আছেন। আমি খবর নিয়ে জেনেছি তাঁর পাওনাদারদের মধ্যে আছে থিয়েটারের কর্মচারী, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, এস. আর. ব্যানার্জি, ম্যাডান থিয়েটার্স, কমল-কুমারী দাসী, ফাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, হরিবোল্লা রায়চৌধুরী, রমানাথ রায়চৌধুরী, সতীশ রায়চৌধুরী, অনুপচাঁদ বড়াল এবং আরও অনেকে। লক্ষাধিক টাকা দেনা মাথায় নিয়ে তিনি থিয়েটার বন্ধ করেছেন। থিয়েটারের যাবতীয় আসবাবপত্র হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক দখল করেছে। চারুশীলা আরও বললেন, সুযোগ বুঝে শিশিরবাবু দেশ ছাড়া হওয়ার ব্যবস্থা করছেন। কয়েকটি পত্রপত্রিকায় তাঁর বিদেশ যাত্রার সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে অ্যাডভান্স পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের অংশবিশেষের প্রতি চারুশীলা বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন :

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নবতম প্রচেষ্টা

আমেরিকায় নাটক পরিবেশন

আশা করা যাইতেছে আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি শিশিরকুমার নিজস্ব দল লইয়া আমেরিকা যাত্রা করিবেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আমেরিকার প্রতিনিধি মিস্টার এরিক ইলিয়টের নিকট হইতে প্রাপ্ত তার-বার্তায় জানা গিয়াছে তিনি ইতিমধ্যেই ভারতের পথে রওনা হইয়াছেন। অগস্ট মাসের উনিশ তারিখ নাগাদ তিনি এখানে পৌছাইবেন বলিয়া আশা করা যায়। যতদূর জানা গিয়াছে, মিস্টার এরিক ইলিয়ট শিশিরকুমারের সঙ্গে চুক্তির শর্ত তার-বার্তায় জানাইয়াছেন এবং শিশিরকুমার সেই শর্তে রাজি হইয়াছেন। আমেরিকায় শিশিরকুমার যে সকল নাটক অভিনয় করিবেন সেগুলি হইল সীতা, শকুন্তলা, পাষাণী ও সাজাহান।

মাসের পর মাস শুনানী চলতে লাগল। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন লোককে তলব করা হলো। চারুশীলার ডাকা সাক্ষী কোনো-এক জলধর ভট্টাচার্য এলেন। নিজেকে একজন মঞ্চাভিনেতা বলে পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন, আগস্টের ষোল তারিখে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। শিশিরবাবু তাঁকে বলেছেন শীঘ্রই তিনি আমেরিকা যাচ্ছেন এবং সেখানে কয়েক বছর থাকবেন। যদি সেখানে তাঁর ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে তাহলে তিনি হয়তো আর ফিরবেন না। জলধর জানেন যে, বর্তমানে শিশিরকুমার খুব দুরবস্থায় আছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা বিচারাধীন আছে।

অতঃপর শিশিরকুমার ভাদুড়ী চারুশীলা ও জলধর ভট্টাচার্যের বক্তব্য নিয়ে বিচার-বিবেচনায় মন দিলেন। চারুশীলার বিবৃতি সম্পর্কে তিনি বললেন, গত পঁচিশে মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারের উপেনবাবু আমাকে অনুরোধ করেন চারুশীলাকে ছেড়ে দিতে। আমি তাঁর সে-অনুরোধ রাখতে পারিনি। সাতাশ তারিখে চারু-শীলা নিজে এসে আমাকে অনুরোধ করে মিনার্ভায় তাকে অভিনয়ে অনুমতি দেওয়ার জন্যে। সেদিনও আমি রাজি হইনি। তিরিশ তারিখে তার অ্যাটর্নির চিঠি পেয়ে আমি অবাক হলাম। সেই দিনই শহরের রাস্তায় বড়ো বড়ো পোস্টার আমার চোখে পড়ে, সে মিনার্ভায় যোগ দিয়েছে। চুক্তিভঙ্গের দায়ে চারু অবশ্যই অপরাধী এবং চুক্তি থাকা অবস্থায় তাকে থিয়েটারে নেওয়ায় উপেনবাবুও সমান অপরাধী।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী আরও বললেন, চারুশীলা অভিযোগ এনেছে আমি দেনার দায়ে বিপর্যস্ত। কিন্তু তার সবটা সত্যি নয়। বর্তমানে কোনো স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে না হলেও এখানে-সেখানে পেশাদার হিসাবে আমি অভিনয় করছি। আমার দেনার হিসেব চারুশীলা যা দিয়েছে তা অতিরঞ্জিত। তাছাড়া নাট্যমন্দির একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান। নাট্যমন্দির লিমিটেডের দেনার জন্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে কতটা দায়ী সেটা মহামান্য আদালতই বিচার করবেন। আমেরিকায় নাটক মঞ্চস্থ করার জন্যে মোট তেরো হাজার ডলারের বিনিময়ে চার সপ্তাহের সফর-সূচীর একটা প্রস্তাব আমার কাছে এসেছে। কিন্তু তা এখনও পাকা হয়নি। বিদেশি ভাষায় নাটক পরিবেশন করে আমি সেখানে তা দীর্ঘদিন চালাতে পারব না একথা নিশ্চয়ই ঠিক।

জলধর ভট্টাচার্যের বিবৃতি উল্লেখ করে শিশির ভাদুড়ী বললেন, আমি কোনো-দিন জলধরের নাম শুনিনি। তাকে আমি মোটেই চিনি না। সে নিজেকে একজন অভিনেতা বলে পরিচয় দিয়েছে কিন্তু আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি সে উপেন্দ্র মিত্রের একজন সাধারণ কর্মচারী। ধর্মাবতারের কাছে সে মিথ্যা এফিডেভিট পেশ করেছে।

শিশিরকুমারকে সমর্থন করে অভিনেতা যোগেশ চৌধুরী আদালতে বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন, আমি একজন নাট্যকার এবং শিশির-সম্প্রদায়ের একজন প্রধান অভিনেতা। আমি সীতা ও দিগ্বিজয়ী নামে দু'খানি জনপ্রিয় নাটকের রচয়িতা। নাট্যমন্দির বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমরা কাঁচড়াপাড়ায় কয়েকবার নাটক মঞ্চস্থ করি। যদিও চারুশীলা আমাদের সঙ্গে যত্রতত্র অভিনয় করতে বাধ্য

ছিল, তবু শিশিরবাবুকে অমান্য করে সে কাঁচড়াপাড়া যেতে অসম্মতি জানায়। চারুশীলাকে শিশিরবাবু কোনোদিনই অন্য থিয়েটারে চাকরি খুঁজে নিতে বলেননি।

মামলা ক্রমে জটিল হয়ে উঠল। দু'টি মামলার শুনানী একসঙ্গে চলতে লাগল। আদালতের নির্দেশে উপেন্দ্র মিত্র জবানবন্দী দিলেন। তিনি বললেন, শিশিরকুমার ও চারুশীলার মধ্যে চুক্তির শর্ত সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। মার্চ মাসের শেষের দিকে চারুশীলা এসে আমাকে বলে শিশিরবাবু তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। নাট্যমন্দির বন্ধ হওয়ায় আমি তার কথায় বিশ্বাস করে তাকে কাজে নিযুক্ত করি। তার সঙ্গে শিশিরবাবুর চুক্তি যে' বলবৎ আছে আমার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। আমি জানতাম নাট্যমন্দির বন্ধ হয়ে গেছে এবং শিশিরবাবু মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন। রঙ্গজগৎ থেকে তাঁর প্রস্থান সম্পর্কে নবশক্তি, শিশির ও ভোটরঙ্গ পত্রিকায় বিস্তারিত সংবাদ আমার নজরে এসেছে। এবং নাট্যমন্দিরের তরফ থেকে তার কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি। ভোটরঙ্গ পত্রিকার অংশবিশেষ মেলে ধরে তিনি বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রকাশিত সংবাদটির বয়ান :

আজ আমরা নাট্যানুরাগী দর্শকদের কাছে একটা দুঃসংবাদ পরিবেশন করছি। নবযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী চিরকালের জন্য রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন। গত শনিবার বলিদান নাটকে শিশিরকুমার দুলালচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। রবিবারও ষোড়শী নাটকের জীবানন্দকে আমরা দেখতে পাইনি। শিশিরকুমারকে বাদ দিয়ে নাট্যমন্দির কিছুতেই চলতে পারে না। দোলপূর্ণিমার রাত্রে শিশিরকুমার নিজে তাঁর অবসর গ্রহণের কথা আমাদের বলেছেন। শুধু আমাদের নয়, সেদিনের উপস্থিত দর্শকদের নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি বিদায় গ্রহণের কথা জানিয়েছেন। শিশিরবাবুর অবসর নেওয়ার কথা শুনে সেদিনের দর্শকরা দুঃখে অভিভূত হয়েছিল। স্তব্ধ নীরব শোকাহত। তাদের মাথায় রাঙা আবির। তাদের চোখও রাঙা হয়ে উঠেছিল বেদনায়। শিশিরবাবু তাঁর বিদায়ী ভাষণে বলেছেন নাট্যলোক ছেড়ে অন্য যে-কোনো কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন।

নাট্যমন্দিরের অবস্থা এখন কী দাঁড়াবে তাই নিয়ে সাধারণের মনে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্বস্তসূত্রে আমরা জেনেছি বিশ্বনাথ ভাদুড়ী বম্বে গিয়ে ছায়াছবিতে কাজ করবেন। রবি রায় অহীন্দ্র চৌধুরীর বায়োস্কোপ কোম্পানীতে যোগ দেবেন। যোগেশ চৌধুরী নাটক সম্বন্ধে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা

চালাবেন। অন্য থিয়েটারে যোগ দেবেন শৈলেন চৌধুরী ও জীবন গাঙ্গুলী। অমলেন্দু মিনার্ভায় অভিনয় করবেন। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে প্রভা মনমোহন থিয়েটারে যাবে। চারুশীলা মিনার্ভায় যোগ দেবে। কঙ্কা এই পেশা ছেড়ে কোন মেয়ে স্কুলে প্রধানা শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করবে। তাহলে, শিশিরবাবু কি বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপকের জীবনে ফিরে যাবেন ?

আদালতে উপেন্দ্র মিত্রের কৌঁসুলী ভোটরঙ্গ পত্রিকার বিষয়বস্তু তর্জমা করে বিচারপতিকে শোনালেন। উপেনবাবু মুচকি হেসে দর্শকের সারিতে আসন গ্রহণ করলেন। তারপর উপেনবাবুর তাঁবেদার কোনো-এক গণপতি বড়াল সাক্ষ্য দিতে উঠে বললেন, চোদ্দ মার্চ আমি নাট্যমন্দিরে শঙ্খধ্বনি নাটক অভিনয়ের সময়ে উপস্থিত ছিলাম। নাটক অভিনয়ের শেষে বেশ পরিবর্তনের আগেই শিশিরবাবু মঞ্চে উপস্থিত হয়ে দর্শকদের বললেন, নাট্যজগৎ থেকে তিনি চিরদিনের জন্যে বিদায় নিচ্ছেন। এবং ভবিষ্যতে তিনি অন্য কোনো পেশা বেছে নেবেন।

সবশেষে চারুশীলা শিশিরকুমারের বিবৃতিকে নস্যাৎ করার জন্যে আর একখানা হলফনামা পেশ করলেন। তাঁর মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। তিনি তখন একেবারে বেপরোয়া। নটচূড়ামণি শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে জনসমক্ষে বেইজ্জত করার জন্যে চারুশীলা বদ্ধপরিকর। তাঁর পূর্বতন বিবৃতির পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। জোর গলায় বললেন, শিশিরবাবুর আমেরিকায় যাওয়ার কথা পাকা। সেই প্রসঙ্গে তিনি অগস্টের কুড়ি তারিখের স্পোর্টস, স্টেজ অ্যাণ্ড স্ক্রীন পত্রিকার একটি অংশ আদালতের দৃষ্টিগোচর করলেন। সেটি তর্জমা করলে যা দাঁড়ায় তার অর্থ হলো :

> বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে, শিশিরকুমার ভাদুড়ী আমেরিকায় যাওয়ার জন্য পাসপোর্টের আবেদন করেছেন। শীঘ্রই এ বিষয়ে আমরা পাঠকদের বিস্তারিত সংবাদ জানাব।

এইসব সাক্ষীসাবুদের পর দু'পক্ষের কৌঁসুলীর সওয়াল-জবাব শুরু হলো। শিশিরকুমার তখন আদালতে অনুপস্থিত। বিচারপতি প্যাংক্রীজের এজলাসে তিন দিন ধরে শুনানী চলল। বিচারপতি চারুশীলার অনুকূলে রায় দিলেন। শিশির-কুমারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার আদেশ দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে এই আদেশও দিলেন যে শিশিরকুমার যদি জামানত হিসাবে অবিলম্বে আদালতে দু'হাজার টাকা জমা দেন তাহলে তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে পারবেন। মামলার চূড়ান্ত আদেশ পরে দেওয়া হবে।

শিশিরকুমার ভাবছিলেন—অদৃষ্টের একি নির্মম পরিহাস। সেদিন বাড়িতে বসে

সেই কঠিন দণ্ডাদেশ শুনে হতাশ হয়েছিলেন শিশিরকুমার। কোনোরকমে টাকা জোগাড় করে চারুশীলার পাওনা তিনি মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর মামলার বেড়াজাল ডিঙিয়ে উনিশ শ' তিরিশ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি আমেরিকার পথে পাড়ি দিলেন ভাগ্য অন্বেষণের জন্যে। তাঁর ভাঙা মনে সেদিন এক নতুন আশা। কম্পিত বুকে এক নতুন জীবনের স্পন্দন। যে বাঁশি ভেঙে গেছে তাতে তিনি আবার সুর আনবেন। বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি, ভাব ও রস তিনি পৌঁছে দেবেন দূর-দূরান্তরের এক দেশে। নাটকের মধ্য দিয়ে হবে পৃথিবীর দু'প্রান্তের দু'টি দেশের শিল্পচেতনার সেতুবন্ধন।

প্রবোধ গুহর খামখেয়াল আর ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার জন্যে স্টারের ভরাডুবি হয়েছিল। মনমোহন তো আগেই তাঁর হাত থেকে চলে গেছে। অতঃপর স্টারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজা রাজকিষেণ স্ট্রিটে তিনি গড়লেন নাট্যনিকেতন। কিন্তু তাঁর তখন রাহুর দশা। অদৃষ্ট তাঁর পিছু ছাড়ল না। একের পর এক মামলায় জড়িয়ে পড়লেন তিনি। নাট্যনিকেতন খোলার সময়ে সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল বৃটিশ ইলেকট্রিক স্টোর্স। প্রথম ধাক্কাটা এল তাদের কাছ থেকে। একত্রিশ সালের জুলাই মাসে তারা হাইকোর্টে মামলা করল। পাওনা পাঁচ হাজার টাকা। প্রবোধ গুহ হাজির হলেন না। তখন আদালত থেকে নাট্যনিকেতনের সমুদয় আসবাবপত্র আটক করার আদেশ হলো। খবর কানে আসতেই প্রবোধ-গুহ হাইকোর্টে গেলেন। অ্যাটর্নি মণিলাল মল্লিককে নিয়োগ করে বিচারপতির কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর পক্ষে ব্যারিস্টার দাঁড় করালেন হাসান সারওয়ার্দিকে। বিচারপতি বাকল্যাণ্ড সব শুনে বললেন, এখনি আড়াই হাজার টাকা দিলে ক্রোকের আদেশ স্থগিত হবে। আগামী দু'মাসের মধ্যে বাকি টাকা না দিলে থিয়েটারের আসবাব বিক্রি করা হবে এবং প্রবোধ গুহকে গ্রেপ্তার করা হবে। চাপে পড়ে প্রবোধ গুহ সেই আদেশ মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা মামলা হলো প্রবোধ গুহর নামে। নারকেলবাগান লেনের সতীশচন্দ্র সেনের কাছে হাতচিঠিতে তিনি পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। সতীশ মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলেরা সেই টাকার জন্যে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলো। তখন সুদে-আসলে টাকার পরিমাণ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। প্রবোধবাবু কোর্টে হাজির হয়ে নানা আজগুবি গল্প ফেঁদে মামলাটা রুখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। উপায়ান্তর না-দেখে তিনি একটা আপস মীমাংসায়

এলেন। পাঁচ হাজার দু' শ' টাকার ডিক্রী মেনে নিয়ে মাসে এক শ' টাকা হিসাবে দেনা শোধ করবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুত হলেন। প্রবোধ গুহর পক্ষে ব্যারিস্টার ছিলেন এস. পি. চৌধুরী।

নাট্যনিকেতন খোলার সময়ে প্রবোধ গুহ তাঁর বন্ধু শিবনারায়ণ দাস লেনের বিনোদলাল সেনকে কিছু টাকা সাহায্য করার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন। বিনোদলাল বললেন, তাঁর কাছে নগদ টাকা নেই। ইণ্ডিয়ান উড প্রোডাক্টস লিমিটেডের এক শ' খানা শেয়ার তাঁর আছে। সেই শেয়ারগুলো কোথাও রেখে প্রবোধ গুহ যদি টাকা জোগাড় করে নিতে পারেন তাহলে সেগুলো দেওয়া যেতে পারে। সে-সুযোগ প্রবোধ গুহ হাতছাড়া করলেন না। একটা ডীড অফ ট্রানস্ফারের বলে নিজের নামে শেয়ারগুলো অ্যাসাইন করিয়ে নিয়ে কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের কাছে বাঁধা রেখে তিনি টাকা নিলেন। কিন্তু টাকা শোধ দেওয়ার আর কোনো চেষ্টা নেই। বিনোদলাল সেন বার বার তাগাদা দিয়েও যখন দেখলেন টাকা ফেরত পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত, তখন তিনি প্রবোধ গুহর নামে হাইকোর্টে মামলা করে দিলেন। মামলা করার পর নতুন বিপত্তি দেখা দিল। প্রবোধ গুহ যে ব্যাঙ্কের কাছে টাকা নিয়ে শেয়ারগুলো জমা রেখেছিলেন, সেই ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে গেছে। তখন বিনোদ নিরুপায় হয়ে অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রবোধ গুহর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধিমতে ফৌজদারি মামলা আনলেন। মামলার ওয়ারেণ্ট পেয়ে প্রবোধ গুহ বাঁচার জন্যে হাইকোর্টে ক্রিমিনাল রিভিসনের শরণ নিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পরিণতির অশুভ সঙ্কেতটা তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। সামান্য টাকার জন্যে যদি তাঁকে জেল খাটতে হয় তাহলে দুঃখের আর সীমা থাকবে না। বিচারপতি লর্ট উইলিয়মস্ ও বিচারপতি ম্যাকনেয়ারের এজলাসে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি বিনোদের সব টাকাটা মিটিয়ে দিলেন।

পর পর আদালতের কয়েকটা ঝামেলা মিটিয়ে প্রবোধ গুহ থিয়েটারে মন দিলেন। সে-সময়ে নাট্যনিকেতনে পালা করে অভিনীত হচ্ছিল সতীতীর্থ, কারাগার, জনা, গৈরিক পতাকা ও জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নতুন নাটক আঁধারে আলো।

অহীন্দ্র চৌধুরী যোগ দেওয়ায় মিনার্ভায় মরা গাঙে প্লাবন এল। নাট্যামোদী দর্শকের একটা বিপুল অংশ মিনার্ভায় ভীড় করতে শুরু করলো। নাটক নামানো

হলো মিশরকুমারী ও আত্মদর্শন। মিশরকুমারী নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরীর আবন চরিত্র রূপায়ণের কোনো বিকল্প আজও হয়নি। অন্য নাটক যা চালানো হয়েছিল তা হলো সিংহল বিজয় ও বিষবৃক্ষ। অহীন্দ্র চৌধুরী ছাড়া তখন মিনার্ভা থিয়েটারের শিল্পী তালিকায় ছিলেন শরৎ চ্যাটার্জি, বঙ্কিম দত্ত, নবাগত জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, হীরালাল চ্যাটার্জি, গণেশ গোস্বামী, নিরুপমা ও চারুশীলা। আরও একটি নতুন নাটক খোলা হয়েছিল। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তর দেবযানী।

ইতিমধ্যে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে রঙমহল থিয়েটার চালু হয়েছে। শিল্পীগোষ্ঠীতে ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কার্তিক দে, রবি রায়, সরযূবালা ও প্রকাশমণি। শিশিরকুমার ভাদুড়ী আমেরিকা থেকে ফিরে এসে কিছুদিন রঙমহলে অভিনয় করেছিলেন। উৎপলেন্দু সেনের লেখা সিন্ধু গৌরব নাটক রঙমহলকে গৌরবান্বিত করেছিল।

সেই সময়ের অন্য এক ঘটনা। কলকাতার রাস্তায় পোস্টার পড়ল রঙমহলে নতুন নাটক উৎপলেন্দু সেনের সিন্ধু গৌরব। উদীয়মান নট শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জির রঙমহলে যোগদান এবং সিন্দু গৌরব নাটকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রূপদান। শরৎ চ্যাটার্জি অল্পদিন অভিনয় করেই বেশ নাম করে ফেলেছেন। নৈহাটির ব্যানার্জিপাড়া থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়া করতেন। দেখতে সুপুরুষ। দরাজ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। তিনি তখন মিনার্ভার উপেন্দ্রকুমার মিত্রের অধীনে নিয়মিত শিল্পী। তাঁর রঙমহলে যোগদানের খবর পোস্টারে দেখে উপেন্দ্র মিত্র রেগে আগুন। দেড় বছর আগে তাঁর সঙ্গে উপেন্দ্র মিত্রের যে এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল তার মেয়াদ তখনও দেড়বছর বাকি। চুক্তির শর্ত ছিল প্রথম বছরে শরতের মাইনে এক শ' পঁচিশ টাকা, দ্বিতীয় বছরে এক শ' চল্লিশ টাকা এবং তৃতীয় বছরে এক শ' পঞ্চাশ টাকা। রঙমহলের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার কয়েকদিন আগে থেকেই শরৎ চ্যাটার্জি অসুস্থতার অজুহাতে থিয়েটারে আসছিলেন না। কেন আসছিলেন না সেটা উপেন্দ্র মিত্রের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। উপেন্দ্র মিত্র শরৎ চ্যাটার্জি ও রঙমহলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করলেন। তিনি বিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী জানালেন। রঙমহলে অভিনয়ে বিরত থাকার জন্যে তিনি শরতের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করলেন। শরতের সই করা চুক্তিপত্র দেখে বিচারপতি সেই মর্মেই আদেশ দিলেন। এই অন্তর্বর্তী আদেশের পর শরৎ চ্যাটার্জি বা রঙমহল আর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। শরৎ

চ্যাটার্জি মাথা নিচু করে মিনার্ভায় ফিরে গেলেন।

অন্য থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং নিজের থিয়েটারকে বাঁচাতে উপেন্দ্র মিত্র দেনায় পাকে পাকে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আশা নিয়েই তিনি বেঁচেছিলেন। কিন্তু বাধার পর বাধা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। সবে থিয়েটার তার পূর্বগৌরব ফিরে পেতে চলেছে। সেই সময়ে কলকাতার প্রমোদ প্রাঙ্গণে সবাক ছায়াছবির আবির্ভাব থিয়েটার ব্যবসাকে দারুণভাবে ধাক্কা দিল। ক্রমাগত ক্ষতি হওয়ায় উপেনবাবু পুরনো পাওনাদারদের কিস্তি মেটাতে পারলেন না। ফলে আবার মামলা তাঁর পিছনে ধাওয়া করল। হরিপ্রসাদ গনেরিওয়ালার কাছে তিনি হুণ্ডিতে দু' হাজার টাকা ধার করেছিলেন। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময়ে হরিপ্রসাদ সেই হুণ্ডি বেচে দেন সুরেন্দ্রনাথ বসু বলে একজনকে। উপেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ না-করেই সুরেন্দ্র হাইকোর্টে নালিশ করে দিলেন। আদালতের সমন এল উপেন্দ্রকুমারের কাছে। তিনি জানতেন হুণ্ডির মামলা লড়তে গেলে পুরো টাকাটা আদালতে জমা রাখতে হবে। সেই মুহূর্তে দু' হাজার টাকা তাঁর পক্ষে বের করা অসুবিধে ছিল। এর আগে আদালতে দাঁড়িয়ে মহাজনের টাকা শোধ করার যেসব অঙ্গীকার করেছিলেন, অনেক ক্ষেত্রেই তিনি কথা রাখতে পারেননি। তাই তিনি এ-মামলা নিয়ে আর অগ্রসর হলেন না। তিনি হাজির না হওয়ায় মামলাটা একতরফা ডিক্রি হয়ে গেল। আরও দু' হাজার টাকার দেনা মাথায় চেপে গেল। টাকার প্রয়োজনে তিনি একটি বিশেষ সম্মিলিত অভিনয়-রজনীর ব্যবস্থা করে প্রতাপাদিত্য নাটক মঞ্চস্থ করলেন। অভিনয়ে ছিলেন প্রতাপ নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কমল দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানন্দ অহীন্দ্র চৌধুরী, বসন্ত রায় কার্তিক দে, সুন্দর রবি রায়, রডা ভূমেন রায়, শঙ্কর শরৎ চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দরাম জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী চারুশীলা ও কাত্যায়ণী বেদানাবালা।

ইতিমধ্যে উনিশ শ' একত্রিশ সালে হাইকোর্টের আদেশে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যমন্দির লিকুইডেশনে গিয়েছিল। লিকুইডেটর হলেন মন্মথনাথ ঘোষ ও শিশিরকুমার যুগ্মভাবে। নাট্যমন্দির তখন আকণ্ঠ দেনায় ডুবে আছে। পাওনাদারদের মধ্যে থিয়েটারের লোকজন ছাড়া বাইরের যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন অশ্বিনীকুমার মুখার্জি, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, অ্যাটর্নি যোগেশচন্দ্র প্রামাণিক, গোরাচাঁদ দে, অফিসিয়াল

রিসিভার, সুবোধচন্দ্র মিত্র।

মানুষের ভাগ্য যখন খারাপ হয় তখন সোনামুঠি হয় ধুলোমুঠি। ব্যবসায়িক সাফল্য খুঁজতে গিয়ে উপেন্দ্র মিত্র আর্থিক অনটনের সামনে পড়েছেন আর অসম্মান কুড়িয়েছেন। মামলা তাঁকে চিরটা কাল তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। গায়িকা-অভিনেত্রী আঙ্গুরবালা আটাশ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে শিল্পী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। সে-সময়ে তিনি থাকতেন তিরিশের দুই নীলমণি মিত্র স্ট্রিটে। উপেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে লেখাপড়া অনুযায়ী তাঁর মাইনে ঠিক হয়েছিল প্রথম বছরে মাসে দু'শ' ষাট, দ্বিতীয় বছরে দু'শ' পঁচাত্তর ও তৃতীয় বছরে দু'শ' নব্বই। তাছাড়া বোনাস হিসেবে এক হাজার টাকা। চুক্তি শেষ হলে আঙ্গুরবালা থিয়েটার ছেড়ে দিলেন এবং পাওনা টাকার জন্যে একেবারেই আচমকা হাইকোর্টে নালিশ করে দিলেন। উপেন্দ্র মিত্র খুবই বিপদে পড়ে গেলেন। একের পর এক এভাবে মামলা রুজু হলে থিয়েটার অচল হয়ে যাবে। অ্যাটর্নি কালীনাথ মিত্তির কোম্পানীতে গিয়ে তিনি মামলাটা মিটমাটের ব্যবস্থা করলেন। আঙ্গুরবালার সঙ্গে কথা বলে একটা রফা করলেন তিনি। সেইদিন উপেন্দ্র মিত্র আঙ্গুরবালাকে এক শ' টাকা দিলেন। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ষাট টাকা দেবেন বলে কথা দিলেন। এই প্রস্তাবে আঙ্গুরবালা খুশি হলেন না। অত দীর্ঘদিন তিনি অপেক্ষা করতে পারবেন না বলে জানালেন। তখন উপেন্দ্র মিত্র বললেন, এই ব্যবস্থা চলার মাঝে তিনমাসের মধ্যে তিনি আঙ্গুরবালার জন্যে একটি বিশেষ সম্মান-রজনী ঘোষণা করে অভিনয়ের অয়োজন করবেন। সেই অভিনয় রাত্রির টিকিট বিক্রির টাকা থেকে আঙ্গুরবালাকে তিনি এককালীন হাজার টাকা দেবেন। বাকি টাকা মাসে পঁচিশ হিসাবে শোধ করবেন। বিচারপতি আমীর আলীর সামনে বত্রিশ সালের আগস্ট মাসে দুজনে সোলেনামা সই করলেন। শর্ত কিন্তু পরে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়নি। আঙ্গুরবালা আদালতের চার দেওয়ালের বাইরে উপেনবাবুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন।

এই অবস্থার মধ্যে আরও একটা বৃহৎ মামলায় উপেন্দ্র মিত্রকে জড়িয়ে পড়তে হলো। মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে যাওয়ার পর তিনি তাঁর ৩/১এ, নলিন সরকার স্ট্রিটের বাড়ি বাঁধা রেখে শোভাবাজারের মুরলীমোহন রায়চৌধুরীর কাছে পঞ্চান্ন হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। দেয় বাৎসরিক সুদের পরিমাণ ছিল শতকরা সাড়ে ন'টাকা। উপেন্দ্র মিত্র বহুদিন সুদ গুণে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুরলীমোহন

আসল টাকার জন্যে মামলা করে দিলেন। বিচারপতি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের ওপর ভার দিলেন পাওনা টাকা হিসেব করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে। মুরলী-মোহনের পাওনা হিসেব করে দেখা গেল চৌষট্টি হাজার আট শ' তিন টাকা দু' আনা। বিচারপতি আমীর আলি বন্ধকী বাড়িখানা বিক্রির হুকুম দিলেন। হাইকোর্টের নীলামে মাত্র পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকায় উপেনবাবুর চোখের সামনে বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল। মুরলীমোহনের পক্ষে নীলামে সর্বোচ্চ দর দিয়েছিলেন তাঁর অ্যাটর্নি বি. এন. বাসু অ্যাণ্ড কোম্পানী।

ওদিকে স্টার থিয়েটারের অবস্থাও অহীন্দ্র চৌধুরী ছেড়ে দেওয়ার জন্যে বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। তারা নতুন নাটক খুললো বিদ্রোহিনী। সে-নাটক শোচনীয়-ভাবে ব্যর্থ হলো। তারপর অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ দেওয়া অনুরূপা দেবীর পোষ্যপুত্র নাটক নামালো। ব্যবসায়িক দিক থেকে সেটা সাফল্য এনেছিল। পোষ্যপুত্র নাটকে শ্যামাকান্তের ভূমিকায় দানীবাবুর শেষ অভিনয়। তারপর জীবনের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে উনিশ শ' বত্রিশ সালের আটাশ নভেম্বর তারিখে। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার জন্যে উইল করেছিলেন। হাইকোর্ট থেকে সেই উইলের প্রোবেট নেওয়া হয়েছিল। দানীবাবু জীবিতকালেই স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন। শেষ বয়সে বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। কুমারকৃষ্ণ মিত্রের অনুরোধে তাঁর গিরিডির বাড়িতে গেলেন বিশ্রাম নিতে। তারপর কলকাতায় ফিরে চিরবিশ্রাম। মৃত্যুর সময়ে দানীবাবু যা বিষয়সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন তার দাম ছিল নব্বই হাজার টাকা। উইলে দানীবাবু বলেছেন, সামাজিক মতে বিবাহ বলতে যা বোঝায় তেমন বিবাহ তিনি করেননি। তাঁর দীর্ঘদিনের সুখদুঃখের সঙ্গিনী অমৃতমণি দাসী ছিলেন তাঁর কাছে স্ত্রীর চেয়ে বেশি। অমৃতমণির গর্ভে দানীবাবু দু'টি সন্তান লাভ করেছিলেন। ছেলে পূর্ণচন্দ্র ও মেয়ে লবঙ্গলতা। দানীবাবুও গিরিশের মতো পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁর উইলে তিনি কুলদেবতা শ্রীধর জীউ, গিরিশ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের মূর্তি এবং নিজের গুরুদেব জ্ঞানানন্দ স্বামীর প্রতিকৃতির নিত্যপূজার নির্দেশ দিয়ে যান। পূর্ণচন্দ্র, লবঙ্গলতা ও তাঁর বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে তিনি উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করেন। তেরো নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ি তিনি দেবত্র করে যান। নিবেদিতা লেনের বাড়িখানি তিনি ছেলে ও মেয়েকে সমানাংশে দিয়ে যান। এছাড়া অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, বিভিন্ন কোম্পানীর

শেয়ার, সমগ্র গিরিশ গ্রন্থাবলী ও গিরিশের লেখা একাত্তর খানি বইয়ের স্বত্বও তিনি ছেলেমেয়েকে দান করেন। তিনি তাঁর শ্যালককে এক হাজার, গিরিশ-জীবনী রচয়িতা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে এক হাজার এবং গুরুদেব জ্ঞানানন্দ স্বামীর মঠে দু' হাজার টাকা দান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দানীবাবুর মৃত্যু নাট্যজগতে নিঃসন্দেহে শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর শবানুগমনে যোগ দিয়েছিলেন নাট্যজগতের লোকজনের সঙ্গে বহু সাধারণ মানুষ। যুগ-স্রষ্টা নটের জীবনাবসানে গিরিশ-পরবর্তী আর একটি যুগের অবসান হলো।

থিয়েটারের দুনিয়ায় তখন সত্যিই দুর্দিন। শত চেষ্টা করেও উপেন্দ্র মিত্র শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটা বৃহৎ মামলা শুরু হলো। মামলা আনলেন লালা গোপীনাথ। মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়িটার মালিকানা বদল হতে হতে তখন বাড়ির মালিক লালা গোপীনাথ। উনিশ শ' একত্রিশ সালে তিনি যখন বাড়ির দখল নেন তখন আট হাজার টাকা বাড়িভাড়া বাকি। উপেন্দ্র মিত্র তাঁকে ওই টাকার একটা হাতচিঠি লিখে দেন। তিনিও উপেন্দ্রকে ভাড়াটিয়া হিসাবে স্বীকার করে নেন। সেদিন দুজনের মধ্যে নতুন করে একটা চুক্তি হয়েছিল। অ্যাটর্নি দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র গ্যারাণ্টার ছিলেন। তাঁকে চার হাজার টাকার সিকিউরিটি দিতে হয়েছিল। ব্যবসা মন্দা যাওয়ার সময়ে উপেন্দ্র নিয়মিত ভাড়া দিতে পারেননি। ফলে অনেক টাকা বাকি পড়ে গিয়েছিল। লালা গোপী-নাথ হঠাৎ হাতচিঠির আট হাজার টাকার জন্যে নালিশ করলেন। সেই সঙ্গে বকেয়া ভাড়ার দাবী জানালেন এবং থিয়েটার থেকে উচ্ছেদেরও নালিশ করলেন। লালা গোপীনাথ এত তাড়াতাড়ি কোনোরকম সুযোগ না-দিয়ে এইরকম নোংরামির আশ্রয় নেবেন উপেন্দ্র মিত্র ভাবতে পারেননি। মামলার সমন পেয়ে তাঁর দু'চোখে অন্ধ-কার ঘনিয়ে এল। তাঁর সম্মান-সম্ভ্রম সংকটাপন্ন। জীবিকার ভিতটায় এবার বড়ো রকমের ফাটল ধরেছে। তবে কি থিয়েটার চলে যাবে?

মনে সাহস নিয়ে পরের দিন উপেন্দ্র মিত্র আদালতে ছুটলেন। মনোবল ছাড়া সেদিন তাঁর আর-কোনো সম্পদই ছিল না। সেই মনোবল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে ভরসা দিয়েছে, শক্তি জুগিয়েছে। আদালতে তিনি বললেন, মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ির মালিক লালা গোপীনাথ একা নন। আমার কাছে যা কাগজপত্র আছে তা থেকে বলতে পারি কোনো-এক লালা রামনাথও এই সম্পত্তির অংশীদার। আমার কাছে প্রমাণ আছে লালা গোপীনাথ ও লালা রামনাথের মধ্যে

সম্পত্তি সম্পর্কিত একটি মামলা পাঞ্জাবের ফিরোজপুর আদালতে বিচারাধীন আছে। যৌথ সম্পত্তিতে তাদের নিজ নিজ অংশ চিহ্নিত না-হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ, ফিরোজপুরের আদালতের মামলার চূড়ান্ত বিচার না-হওয়া পর্যন্ত এখানে এ-মামলা চলতে পারে না।

উপেন্দ্র মিত্রের এই কথায় অপরপক্ষ ঘোরতর আপত্তি জানাল। কিন্তু তাঁর কণ্ঠরোধ করা গেল না। তিনি বললেন, কয়েকমাস আগে আমি রামনাথের অ্যাটর্নি শশিশেখর ব্যানার্জির কাছ থেকে একখানি চিঠি পাই। চিঠির বক্তব্য ছিল মিনার্ভা থিয়েটার-বাড়ির মালিক ফিরোজপুরের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কেদারলাল ছেদিলাল। লালা রামনাথ সেই প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার। থিয়েটার-বাড়ি কেনার দিন থেকে আমি ওই ফার্মের দু'জন অংশীদার গোপীনাথ ও রামনাথের ভাড়াটিয়া। রামনাথ নাকি তাঁর নিজের অংশের পাওনা বাবদ ভাড়া কিছুই পাননি। আদালতে উপেনবাবু শশিশেখর ব্যানার্জির লেখা সেই চিঠিখানি দাখিল করলেন। উপেনবাবু বললেন, আমি যদি কোনো অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ভাড়াটিয়া হই, তাহলে একা গোপীনাথের অনুকূলে আমার অঙ্গীকারকৃত হাতচিঠির কোনো দাম নেই। গোপীনাথের বিরুদ্ধে আমি মানহানি ও ক্ষতিপূরণের মামলা আনব। কারণ, আমি ভাড়াটিয়া হিসাবে বহাল থাকতে আদালতে মামলা করার আগে গোপীনাথ পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে মিনার্ভা থিয়েটার লীজ দেওয়া হবে। এই মামলায় বাদী গোপীনাথের সঙ্গে যে-পর্যন্ত না রামনাথের নাম যুক্ত হয়, ততক্ষণ এ-মামলা কিছুতেই চলতে পারে না।

ঘটনার আকস্মিকতায় উপেন্দ্রনাথ মিত্র একটুও বিচলিত হননি। খুব ভালোভাবেই ভালো যুক্তি দিয়ে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। আর্জির জবাব পড়ে লালা গোপীনাথ স্তম্ভিত। তাঁর অ্যাটর্নিকেও ভাবতে হয়েছিল। কিন্তু অল্পদিন পরে পাল্লা ওদের দিকেই ভারি হলো। সব দিক থেকে দুর্ভাগ্য নেমে এল উপেন্দ্র মিত্রের কপাল জুড়ে। ফিরোজপুরের আদালতে সম্পত্তি বাঁটোয়ারার মামলায় মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ির সম্পূর্ণ অংশ পেলেন লালা গোপীনাথ। সেখানকার বিচারের রায় পাওয়ামাত্র তিনি হাইকোর্টে আবেদন করলেন মিনার্ভা থিয়েটারের ওপর রিসিভার বসানোর জন্যে। উপেন্দ্র মিত্রের হাত থেকে বাড়িওয়ালা সমস্ত কর্তৃত্ব কেড়ে দিতে চাইলেন।

একত্রিশ সালে বড়দিনের ছুটির ঠিক আগে রিসিভার নিয়োগের আবেদনের শুনানী হলো। উপেন্দ্র মিত্রের ভাগ্য তখন কিছুটা সুপ্রসন্ন। জজসাহেব রিসিভার

নিয়োগ করলেন না। তিনি একটি অন্তর্বর্তী আদেশ দিলেন। বিচারপতি বললেন, গোপীনাথের পাওনার পরিমাণ পরে নির্ধারিত হবে। বর্তমানে উপেন্দ্র মিত্র লালা গোপীনাথকে আড়াই হাজার টাকা দেবেন। উপেনবাবুই থিয়েটার চালাবেন। পুনরায় আদেশ না-দেওয়া পর্যন্ত থিয়েটারের টিকিট বিক্রির টাকার শতকরা পঁচিশ ভাগ উপেনবাবু গোপীনাথকে দিতে বাধ্য থাকবেন।

বিচারপতি ভালোই আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে-আদেশ মেনে চলা উপেন্দ্র মিত্রের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। শতকরা পঁচিশ টাকা দিয়ে থিয়েটার চালানো অসম্ভব হয়ে উঠল। কারণ, অন্যান্য মামলার ডিক্রির কিস্তি আছে ও বর্তমান মামলার খরচ আছে। কয়েকমাস টাকা দেওয়ার পর উপেনবাবু আর দিতে পারলেন না। গোপীনাথ আবার আদালতে হাজির হলেন। উপেন্দ্র মিত্রের কপাল অত্যন্ত ভালো যে সেবারে অত্যন্ত সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল বিচারক আমীর আলির কাছে শুনানীর ভার পড়ল। গোপীনাথের ব্যারিস্টারের প্রবল আপত্তি গ্রাহ্য না-করে বিচারপতি আদেশ দিলেন কমপক্ষে মাসিক একহাজার টাকা উপেন মিত্র দেবেন। টাকা না-দিলে গোপীনাথের জন্য আদালতের দরজা খোলা রইল। এই আদেশে গোপীনাথ মোটেই সন্তুষ্ট হননি। তাঁর পক্ষে ব্যারিস্টার ছিলেন সুধীর রায় এবং উপেন্দ্রনাথের বি. সি. ঘোষ।

দুঃখের বিষয়, আদালত থেকে এত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও মামলার বিপুল ব্যয়ভার বহন করে উপেন্দ্র মিত্র বিচারপতির নির্দেশ মেনে চলতে পারলেন না। সময়মতো মাইনে না-পেয়ে অনেক শিল্পী তখন মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেলেন। টিকিট বিক্রি খুব কমে গেল। উপেন্দ্র মিত্রের আর্থিক অবস্থা তখন চরমে পৌঁছেছে।

মামলা শুরু হওয়ার প্রায় একবছর পরে বত্রিশ সালের বাইশে ডিসেম্বর লালা গোপীনাথ আবার রিসিভারের আবেদন জানালেন। সেবারেও আদালত উপেন্দ্র মিত্রের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালো। জজসাহেব আদেশ দিলেন তখনই উপেন্দ্র মিত্রকে এক হাজার টাকা দিতে হবে। পরের মাসে তিন তারিখের মধ্যে তিনি আরও এক হাজার টাকা দেবেন এবং দশ তারিখে দেবেন পাঁচ শ' টাকা। শুনানীর পরবর্তী দিন ঠিক হলো জানুয়ারির দশ তারিখে। যদি আদেশ মতো টাকা উপেন্দ্র মিত্র না-দেন তাহলে তখন রিসিভার নিযুক্ত হবে এবং থিয়েটারের দখল নেবে।

এবারে উপেনবাবু আদালতের নির্দেশমতো টাকা দিয়েছিলেন। কোনো রকমে থিয়েটার চালিয়ে আসছিলেন। মামলার চূড়ান্ত শুনানীর জন্যে দিন গুনছিলেন। অবশেষে এল সেই অভিশপ্ত দিনটি। উনিশ শ' তেত্রিশ সালের বাইশে মার্চ তারিখে বিচারপতি লর্ট উইলিয়ম্‌স-এর এজলাসে এই মামলার দীর্ঘ বিতর্কিত শুনানীর পর শর্তসাপেক্ষে মামলার নিষ্পত্তি হলো। সেদিন থিয়েটার জগতের কলা-কুশলী ও কর্মীদের ভীড়ে এজলাস ভরা ছিল। বিচারপতি তাঁর রায়ে বললেন, হাতচিঠির টাকা এবং মামলা শেষ হওয়ার দিন পর্যন্ত বকেয়া ভাড়া বাবদ উপেন্দ্র মিত্রকে দিতে হবে তেত্রিশ হাজার তিন শ' নব্বই টাকা।

ছ' নম্বর বিডন স্ট্রিটের বাড়ি থেকে তাঁর উচ্ছেদের আদেশ হলো। যতদিন না উপেনবাবু বাড়ির দখল ছেড়ে দেন ততদিন তিনি মাসে দু' হাজার টাকা লালা গোপীনাথকে দেবেন।

যদি উপেন্দ্র মিত্র এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট প্রতি মাসে চোদ্দশ টাকা হিসাবে ও সেপ্টেম্বরে দু' হাজার টাকা দেন তাহলে গোপীনাথ ডিক্রি জারি করবেন না। কিন্তু অন্যথায় তিনি উপেনবাবুকে উচ্ছেদ করে দেবেন।

যখন গোপীনাথ ডিক্রির টাকা আদায় করবেন তখন গ্যারাণ্টার দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্রের জমা রাখা সিকিউরিটির চার হাজার টাকা তাঁকে দিতে হবে।

গোপীনাথের মামলার সব খরচ বহন করবেন উপেন্দ্র মিত্র।

কিছু সুযোগ অবশ্যই উপেন্দ্র মিত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত তিনি ডিক্রির শর্তাবলী পালন করতে পারলেন না। পুজোর ছুটির ঠিক আগে গোপীনাথ থিয়েটার দখল নেওয়ার অনুমতি নিলেন আদালত থেকে। সেই আদেশের পর উপেনবাবু থিয়েটার বন্ধ করে দিলেন।

কলালক্ষ্মীর পূজারী উপেন্দ্রনাথ তখন বার্ধক্যের সীমায় উপনীত। তিনি তখন রিক্ত হৃতসর্বস্ব। তাঁর সেদিনের অসহায় দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়ালেন তারুণ্যের দীপ্তিতে ভাস্বর আশাবাদী এক যুবক। তিনি উপেন্দ্র মিত্রের সুযোগ্য ছেলে সলিলকুমার মিত্র। লালা গোপীনাথের সঙ্গে একটা রফায় আসার ব্যবস্থা করলেন তিনি। তারপর ডিসেম্বরের বারো তারিখে উপেন্দ্র মিত্রের আবেদনক্রমে লালা গোপীনাথের মামলায় সলিল মিত্রকে পার্টি যুক্ত করা হলো। সলিল মিত্রের প্রস্তাবিত খসড়া-চুক্তি লালা গোপীনাথ মেনে নিলেন। ডিক্রির মোট টাকার সাত হাজার দু' শ' উপেনবাবু ইতিমধ্যেই শোধ করেছিলেন। বাকি সমস্ত টাকার দায়িত্ব নিলেন সলিলকুমার মিত্র। সেই বিপুল টাকার অঙ্ক মাথায় নিয়ে সলিল মিত্র

শুরু করলেন তাঁর জীবন-সাধনা। নিভে যাওয়া আলো জলে উঠল মিনার্ভা থিয়েটারে। কলকাতার রাজপথ পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল। শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে চিত্তজয়ী নাটকের পরিবেশন—শক্তির মন্ত্র, রঙবাহার, বামনাবতার, কিন্নরী।

সলিল মিত্র থিয়েটার হাতে নেওয়ার কয়েক মাস পরে চৌত্রিশ সালের বারো এপ্রিল তারিখে উপেন্দ্র মিত্র হাইকোর্টে এসে দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার আবেদন করলেন। তাঁর বয়স তখন উনসত্তর। তাঁর পাওনাদারের সংখ্যা তখন দু' শ' বত্রিশ। এত অধিক সংখ্যক পাওনাদার আর-কোনো দেউলিয়া মামলায় হাইকোর্টে হাজির হননি। প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন তাঁরা। বলেছিলেন, সব কিছু বেনামী করে দিয়ে সবাইকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যেই উপেন্দ্র মিত্রের এই কুশলী প্রয়াস। শেষপর্যন্ত কোনো পাওনাদারের আপত্তিই টেকেনি। অফিসিয়াল অ্যাসাইনির সহৃদয় রিপোর্টের ভিত্তিতে বিচারপতি প্যাংক্রীজ উপেন্দ্র মিত্রকে দেউলিয়া ঘোষণা করলেন।

রঙ্গজগৎ থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিলেন উপেন্দ্র মিত্র। কলকাতার থিয়েটারের প্রমোদ ক্ষেত্র থেকে একটা ব্যক্তিত্ব মুছে গেল। একটা যুগের হলো সমাপ্তি। থিয়েটার ছিল উপেন্দ্র মিত্রের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। উনিশ শ' পনেরো সাল থেকে অটুট নিষ্ঠায় তিনি নাট্য-সরস্বতীর সেবা করে এসেছেন। নিজের হাতে তৈরি করেছেন কত নাট্যকার। গড়ে তুলেছেন অসংখ্য অভিনেতা-অভিনেত্রী। থিয়েটার ছিল তাঁর স্বপ্নের নন্দনকানন, তাঁর সাধনার তীর্থভূমি, তাঁর সিদ্ধির মন্দির। সেই থিয়েটারের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন শান্ত গৃহকোণে। সুযোগ্য উত্তরাধিকারী সলিল মিত্রকে দিয়ে গেলেন তাঁর স্বপ্ন, উদ্যম আর নিষ্ঠার ফসল। ভাবীকালের মানুষকে দিয়ে গেলেন এক প্রদীপ্ত প্রতিভা। উপেন্দ্র মিত্র মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন অন্ধকার দূরে সরে যাবে। আঁধারের বুক চিরে উঠবে নতুন সূর্য। মসিরেখা মুছে যাবে। আকাশ ভরে উঠবে প্রভাতের নবারুণ রাগে।

দুঃখ-সুখের ভেলায় ভাসতে ভাসতে কলকাতার নাট্যজগত এগিয়ে চলে। একটা যুগ-সন্ধিক্ষণে তখন সবকিছুই এলোমেলো। পুরাতন মুছে যাচ্ছে, বিদায় নিচ্ছে। নতুন মাথা তুলছে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। সেই সময়ে নাট্যজগতের সবচেয়ে বড়ো দুঃসংবাদ নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

লোকান্তর। তাঁর শেষ জীবনটা সুখের ছিল না। হয়তো অভিমানও কিছু ছিল তাঁর। সফল নট ও নাট্যকার হিসেবে 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' বিচরণ করেও তাঁর প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি।

তবু ভরিল না চিত্ত…। শিশিরকুমার ভাদুড়ী কলকাতায় ফিরে এলেন। তাঁর আমেরিকায় নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলো। আশাভঙ্গের নিদারুণ নিপীড়নে তিনি মর্মাহত। ফিরে এসে দেখলেন আবার অভিনয় চালু করার মতো মঞ্চ নেই। অর্থবল নেই। পাশে দাঁড়ানোর মতোও তেমন কেউ নেই। নিরুপায় হয়ে তিনি রঙমহল থিয়েটারে অভিনেতা হিসাবে যোগ দিলেন। ঠিক হলো টিকিটের বিক্রয়লব্ধ টাকার শতকরা কুড়ি ভাগ তিনি পাবেন। অগ্রিম হিসাবে পাবেন আড়াই হাজার এবং বোনাস হিসাবে সাড়ে সাত হাজার টাকা। এইভাবে তিনি চালিয়ে গেলেন বত্রিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। পাঁচ বছরের চুক্তি থাকা সত্বেও তিনি রঙমহল ছেড়ে দিলেন। আসলে, ভাবপ্রবণতার সরু তার দিয়ে তাঁর মনটা ছিল বাঁধা। সেই মন বিদ্রোহ করেছিল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি মানিয়ে চলতে পারলেন না।

সবাক সিনেমা তখন জোর কদমে এগিয়ে চলেছে দর্শক মনোরঞ্জনে। ছবি প্রযোজনার ক্ষেত্রে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড অগ্রণী। পরিচালক হিসাবে কাজ করার জন্যে সেখান থেকে শিশিরকুমারের ডাক এল। দু'খানি ছবি প্রযোজনা এবং তাতে অভিনয়ে অংশ নেওয়ার জন্যে তিনি চুক্তিবদ্ধ হলেন। প্রথমটি সীতা ও অপরটি পল্লীসমাজ। প্রথম ছবির জন্যে তিনি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন পাঁচ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয়টির জন্যে পেয়েছিলেন প্রযোজকের লাভের অংশের সাড়ে বারো ভাগ। সব টাকাটাই তাঁর দেনা শোধ দিতে চলে গেল। টাকার সিংহভাগ চলে গেল কান্তি মুখার্জি, নির্মল চন্দ্র এবং ম্যাডান কোম্পানীর ধার শোধ দিতে।

সীতা ও পল্লীসমাজ শেষ করার পর শিশিরকুমার আবার বেকার হয়ে পড়লেন। নাট্যমঞ্চের বাইরে অলসভাবে দিন কাটাতে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠছিল। তিনি নিজের দল নিয়ে অভিনয় করতে চলে গেলেন পূর্ববাংলায় ও তারপর উত্তরপ্রদেশে। কিন্তু কোথাও তিনি আর্থিক সাফল্য পাননি। অভিনয় হয়েছিল জন-অভিনন্দন ধন্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গুণীজনের কাছে পেয়েছিলেন তাঁর

প্রতিভার স্বীকৃতি। কিন্তু আশানুরূপ টাকা পাননি। ফিরে এসে স্টার থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর নিজের কথায় জানতে পারা যায় প্রতি অভিনয় রজনীতে তিনি মাত্র তিরিশ টাকা পারিশ্রমিক পেতেন। আয়ের অধিকাংশই চলে যেত পাওনাদারের হাতে।

ইতিমধ্যে বত্রিশ সালের শেষের দিকে হাইকোর্টে আবার একটি মামলা হলো শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে। বাদী ছিলেন অ্যাটর্নি যোগেশচন্দ্র প্রামাণিক। পাওনা হাজারেরও ওপর। যোগেশচন্দ্রের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন লোকের কাছে শিশির-কুমার হাতচিঠিতে টাকা ধার করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র সেইসব হাতচিঠিগুলো কিনে নিয়ে শিশিরকুমারের নামে মামলা করলেন। আদালতের সমন পেয়েও শিশিরকুমার হাজির হতে পারেননি। তখন তিনি একেবারেই কপর্দকশূন্য। বিচারপতি লর্ট উইলিয়মস্-এর এজলাসে মামলাটা তাঁর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি হয়ে গেল।

সেই সময়ে শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে আরও একটি বড়ো মামলা শুরু হলো। মামলা এনেছিল কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক। নাট্যমন্দিরের পত্তন থেকে ব্যাঙ্ক সময়ে সময়ে তাঁকে টাকা দিয়ে আসছিল। শিশিরকুমারও সাধ্যমতো তা পরিশোধ করছিলেন। কিন্তু থিয়েটার বন্ধের কিছু আগে নেওয়া ন' হাজার টাকা তিনি আর শোধ করতে পারেননি। ইতিমধ্যে কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে যায়। আদালত থেকে নিযুক্ত রিসিভার আদালতের নির্দেশে শিশির-কুমারের নামে নালিশ করেন। শিশিরকুমারের নামে সমন গেল তাঁর বাসস্থান এক শ' আটত্রিশ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে। বার বার খোঁজ করেও তাঁকে পাওয়া গেল না। তখন শেরিফের বেলিফ তাঁর দরজায় সমন আটকে দিয়ে চলে এল।

তারপর আদালতে মামলা উঠল। শিশিরকুমার হাজির হলেন না। সেটিও বিচারপতি লর্ট উইলিয়মস্-এর কাছে একতরফা ডিক্রি হয়ে গেল। টাকার অঙ্ক দশ হাজার পাঁচ শ' সাত টাকা আট আনা। কাগজে-কলমে ডিক্রি পেয়ে ব্যাঙ্ক ভাবতে লাগল টাকা আদায় হবে কোথা থেকে? সম্পত্তি বলতে শিশিরকুমারের কিছুই নেই। থিয়েটারের আসবাবপত্রগুলো পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেছে। টাকা আদায়ের নির্দেশের জন্যে ব্যাঙ্ক আবার আদালতের শরণাপন্ন হলো। ব্যাঙ্কের তরফ থেকে একটা আবেদন পেশ করা হলো। অবিলম্বে শিশিরকুমারকে নোটিশ জারি করা হোক, ডিক্রির টাকা অনাদায়ের জন্যে কেন তাঁকে জেলে পাঠান হবে না তার কারণ দেখাতে হবে তাঁকে। সেই নোটিশ পেয়েও চুপ করে বসে রইলেন শিশির-

কুমার। উপায় তো কিছু নেই। টাকা কোথায়? টাকা ছাড়া মীমাংসার কোন্ পথ তিনি ধরবেন?

আদালতে হাজির না-হওয়ার জন্যে তেত্রিশ সালের জুন মাসের বিশ তারিখে শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলো। শেরিফের অফিসার ছুটলেন হাকিমের হুকুম তামিল করতে। বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নট শিশির-কুমার ভাদুড়ীকে সশরীরে আদালতে হাজির করতে হবে। অনেক অনুসন্ধানের পর জুলাই মাসের পঁচিশ তারিখে শিশিরকুমারকে আদালতে হাজির করা হলো।

বিচারপতি প্যাংক্রীজ তখন এজলাসে বসেছিলেন। আদালত লোকে লোকারণ্য। সেই ঐতিহাসিক ঘটনা দেখার জন্যে ভীড় করেছিলেন উকিল, ব্যারিস্টার, কোর্টের কর্মচারী এবং থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত নানা লোক। জজসাহেব মুখ তুলে শিশিরকুমারের দিকে তাকালেন। তাঁর শান্ত সৌম্য বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু যেন বিব্রত বোধ করলেন তিনি। শিশিরকুমারকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে কেন আনা হয়েছে আপনি জানেন?

শিশিরকুমার জবাব দিলেন, জানি ধর্মাবতার।

তারপর বিচারপতি বললেন, আপনার কিছু বলার আছে?

শিশিরকুমার উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ধর্মাবতার। আমি কিছু বলতে চাই।

শিশিরকুমার কোনো আইনজীবির সাহায্য নিলেন না। কৌঁসুলী নিয়োগ করার আর্থিক সঙ্গতিও তাঁর ছিল না। আদালতের দোভাষীকেও তিনি সবিনয়ে সরে দাঁড়াতে অনুরোধ করলেন। সাবলীল ইংরেজিতে তিনি বিচারপতিকে শোনালেন তাঁর জীবনের উত্থান-পতন, সংগ্রাম ও পরাজয়ের কাহিনী। বিচারপতি প্যাংক্রীজ মন দিয়ে তাঁর সব কথা শুনলেন। হাত থেকে কলম নামিয়ে তিনি ভাবলেন, লৌহকপাটের অন্তরালে রুদ্ধ-কারা এ মানুষের জন্যে নয়। এর বাঁচার পথ করে দিতে হবে। সহৃদয় বিচারপতি তাঁকে এক সপ্তাহ সময় দিলেন এবং বিধিবদ্ধ উপায়ে তাঁকে আদালতের সাহায্য নিতে বললেন। জজসাহেবের ইঙ্গিতটা শিশির-কুমার বুঝেছিলেন। তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে তিনি আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন। পরের দিনই হাইকোর্টের ইনসলভেন্সী রেজিস্ট্রারের কাছে তিনি দেউলিয়া হওয়ার আবেদন করলেন জুলাই মাসের পঁচিশ তারিখে। পাওনাদারদের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও আদালত তাঁকে দেউলিয়া ঘোষণা করল। বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ

নটের নামটা সেদিন মসীলিপ্ত হয়ে গেল। এই ঘটনার চার বছর পরে তিনি দেউলিয়া নাম খণ্ডন করেছিলেন ও শ্রীরঙ্গম থিয়েটার খুলে ফিরে এসেছিলেন নাট্যজগতে। তারপর ভাগ্য বিপর্যয়ে আবার তিনি বিদায় নিয়েছিলেন শূন্য মঞ্চ পেছনে ফেলে। তবু আজও তিনি বেঁচে আছেন একটা ইতিহাস হয়ে। আজও বেঁচে আছেন অপরাজেয় নট তথা নাট্যাচার্য হয়ে। বেঁচে আছেন মননে ও স্মরণে। স্মৃতিতে আর শ্রুতিতে।

—